দ্বীনে হক-এর প্রতি
দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজর, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ৫০/- টাকা

www.pathagar.com

যা বলতে চেয়েছি

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলতা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে–এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটেই দান করেছিলেন। যখনই তাঁরা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সারা পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছে।

যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে এসেছে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ নেই, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খান্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলা'মী বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত

www.pathagar.com

রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে ইসলাম বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়। ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'শয়তানুন আখরাজ অর্থাৎ বোবা শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তাঁরাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে হক সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তাঁরা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই দ্বীনে হক-এর প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে গুণটি অর্জন করতে হবে, তা হলো মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে।

আল্লাহর দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো ঈমানদার আমলে সালেহ্কারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালন না করার কারণেই বর্তমানে মুসলমানরা সারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, নির্যাতিত-নিষ্পেষিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার তাওফীক এনায়েত করুন।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী — **আরাফাত মঞ্জিল**

সাঈদী — **৯১৪, শহীদবাগ- ঢাকা**

www.pathagar.com

আলোচিত বিষয়

'হক'–এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ৯

'হক'–এর প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৫

'হক'-এর বাস্তব সুফল ২৩

'হক'-এর বাস্তবায়নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ৩১

'হক'-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া ৩৪

'হক'-এর সাক্ষ্য দান ও বর্তমান মুসলমানদের কর্মনীতি ৩৭

'হক'-এর দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি ৪৬

'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী ৫৬

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে দুঃসাহসী হতে হবে ৬০

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে নির্লোভী হতে হবে ৬৪

'হক'-এর দাওয়াত দানকারী আল্লাহকে সাহায্য করে ৬৬

হকের দাওয়াত দানকারীকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে ৬৯

'হক' বিরোধিদের ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ৭৩

www.pathagar.com

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

www.pathagar.com

'হক'–এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বহু আয়াতে حق 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে এই حق 'হক' শব্দটির দুটো অর্থ করা হয়েছে এবং আল্লাহর কোরআনেও দুটো অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির প্রথম অর্থ হলো, 'প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ বিষয়, সত্য-সঠিক-নির্ভুল, অভ্রান্ত, ইনসাফ, ন্যায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'অধিকার বা পাওনা।' মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট্ট সূরা– সূরা আসরের মধ্যেও حق হক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই حق হক শব্দের ভেতর উল্লেখিত দুটো অর্থ নিহিত রয়েছে। এই শব্দটি মিথ্যার বা বাতিলের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। ঈমানদারগণ যে সমাজ, দল বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই সমাজে, দলে বা রাষ্ট্রে কোনক্রমেই যেন সত্যের পরিপন্থী, ইনসাফের বিপরীত, মিথ্যা বা বাতিলের অনুকূলে কোন ধরনের কাজ যেন না হতে পারে, সেদিকে সবাই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ঈমানদারদের জীবন হবে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন, এই রঙের বিপরীত কোন ধরনের রঙকে ঈমানদাররা বরদাস্ত করতে পারে না। এখানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বাতিল মতবাদ–মতাদর্শ দেখলে বা হকের বিপরীত কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখলেই ঈমানদাররা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে।

সত্যের বিপরীতে মিথ্যার অনুকূলে কোন শক্তি জেগে ওঠা মাত্র ঈমানদাররা তার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বুহ্য রচনা করে মিথ্যা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে শক্তি ঈমানের বিপরীত কোন কিছুর আমদানী করার চেষ্টা করবে, সে শক্তির উদ্ধত মস্তকে পদাঘাত করে তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে দেবে। ঈমান তথা 'হক'–এর বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের জাগরণকে তারা স্তব্ধ করে দেবে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার যে 'হক' রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালার ওপরেও মানুষের 'হক' রয়েছে। মানুষের ওপরে মহান আল্লাহর 'হক' মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, গোলামী, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মানুষের যে 'হক' রয়েছে, তা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে নিজেই ধার্য করে নিয়েছেন। এই হক মানুষ বা অন্য কোনো শক্তি ধার্য করেনি বা করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে স্বয়ং যদি তা নিজের ওপর ধার্য করে না নিতেন, তাহলে তা আল্লাহর ওপর আরোপ বা ধার্য করার কোনো ক্ষমতাই মানুষের ছিল না।

আল্লাহর ওপর মানুষের 'হক' হলো তিনি মানুষকে প্রতিপালন করবেন, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। মানুষের জীবন ধারণ, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদির জন্য মানুষের যে ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ প্রয়োজন, তা মহান আল্লাহ সরবরাহ করবেন, এটা হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের হক বা অধিকার এবং এই অধিকার মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ নির্ভুল পথ রচনা করতে সক্ষম নয়, এ জন্য আল্লাহর প্রতি মানুষের হক হলো, তিনি মানুষকে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করবেন। মানুষের এই অধিকারও মানুষ না চাইতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে তা পূরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। (সূরা নাহ্ল-৯)

(বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা আল আ'লা-এর ৩ নং আয়াত ও সূরা আল লাইল-এর ১২ নং আয়াতের তাফসীর পড়ুন।)

মানুষ তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে মহান আল্লাহর কাছ থেকে, এটা আল্লাহর প্রতি মানুষের হক। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত মেহেরবানী করে আদালতে আখিরাতে এই 'হক'–ও আদায় করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যাবতীয় 'হক' মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে মানুষের প্রতি তাঁর 'হক'–এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ–قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لاَّ يَهِدِّيْ اِلاَّ اَنْ يُّهْدٰى–

www.pathagar.com

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহাসত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখায়? বলো, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের (হক-এর) দিকে পথ দেখান। তাহলে এখন বলো, মহান সত্যের (হক-এর) দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোনো পথ দেখাতে পারে না, বরং তাকেই পথ দেখাতে হয়। (সূরা ইউনুস-৩৫)

হক–এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়া একান্তই আবশ্যক। মানুষের প্রয়োজন অসীম। শুধুমাত্র তার জীবন ধারনের উপায়-উপকরণ লাভ করার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। তার সবথেকে বড় প্রয়োজন হলো একটি নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। মানুষ তার ব্যক্তি স্বত্তার, শক্তি-ক্ষমতা, সামর্থ-যোগ্যতা, পৃথিবীর যেসব বস্তু নিচয়ের প্রতি সে কর্তৃত্বশীল রয়েছে তার সাথে, পৃথিবীতে যে অগণিত মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের সাথে, অর্থাৎ গোটা বিশ্বলোকের অধীনে অবস্থান করে মানুষ যে কর্মকান্ড করে তার সাথে সে কোন্ আচরণ গ্রহণ করবে, তা নির্ভুলভাবে অবগত হওয়া মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। তার অবগত হওয়া প্রয়োজন, কোন্ পন্থা-পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করলে সামগ্রিকভাবে তার জীবন মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থেকে সফল হতে পারবে এবং তার যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ব্যর্থ না হয়ে সফলতা অর্জন করবে। এই নির্ভুল পথ, পন্থা-পদ্ধতি, নীতি-আদর্শের নামই হলো 'হক' বা মহাসত্য।

আর এই মহাসত্যের দিকে, অভ্রান্ত পথের দিকে যে নেতৃত্ব মানুষকে পরিচালিত করবে, তাই হচ্ছে 'সত্যের হেদায়াত'। এ জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমার প্রতি তোমাদের যা 'হক' রয়েছে আমি তা আদায় করার ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমাদের প্রতি আমার 'হক' রয়েছে, তোমরা কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। এখন তোমরা আমার দাসত্ব ত্যাগ করে, আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করে অন্য যাদের আইন অনুসরণ করছো, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সত্যের হেদায়াত লাভের তথা 'হক' পথপ্রদর্শনের কোনো সূত্র রয়েছে, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে কি?

www.pathagar.com

মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি তারা মহান আল্লাহর 'হক' আদায় না করে। আল্লাহর 'হক' আদায় না করা সবথেকে বড় অকৃতজ্ঞতা। যারা মহান আল্লাহর 'হক' অস্বীকার করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ-فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ-وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-

হে নবী বলে দাও, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত সত্য (হক) এসে পৌছেছে। এখন যে ব্যক্তি সত্য-সোজা পথ অবলম্বন করবে, তার এই সত্য পথ অবলম্বন তারই জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার ভ্রষ্টতা তার পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। (সূরা ইউনুস-১০৮)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে 'হক' শব্দ ব্যবহার করে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক, আল্লাহর প্রতি বান্দার হক, মানুষের পরস্পরের হক, নিজের হক, মানুষ পৃথিবীতে যে পরিবেশে বাস করে তার হক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক, অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষের হক এবং মানুষের প্রতি অন্যান্য সৃষ্টির হক ইত্যাদি বিষয় বুঝিয়েছেন। মানুষের জন্য নির্ধারিত নির্ভুল জীবন বিধান বা হেদায়াতকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হক' শব্দের মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ-

তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তওবা-৩৩)

এই 'হক'–এর বিপরীত যা কিছু রয়েছে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বাতিল বলে ঘোষণা করে বলেছেন, একমাত্র 'হক'–ই টিকে থাকবে আর না-হক তথা বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৮১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ-اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই কথা।

www.pathagar.com

'হক' কল্যাণকর এবং তা পৃথিবীতে টিকে থাকে আর যা কিছু না-হক, তা পানির বুদ্বুদের মতো, পানির ফেনার মতো–যা বিলীন হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاَرْضِ–

যা ফেনা, তা উড়ে যায় আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর (হক) তা যমীনে স্থিতিশীল হয়। (সূরা রা'দ-১৭)

'হক'–এর ওপরে আবরণ দিয়ে তা বেশী দিনে গোপন রাখা যায় না। 'হক'–কে দমিত করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই উদ্ভাসিত করে তোলেন। কোরআন ঘোষণা করছে–

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ–

আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা 'হক'-কে 'হক' হিসাবেই দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতোই দুঃসহ হোক না কেনো। (সূরা ইউনুস-৮২)

আলোচ্য সূরায় মানব জীবন সফল করার লক্ষ্যে যে চারটি গুণ অর্জনের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথম দুটো গুণ অর্থাৎ ঈমান ও আমলে সালেহ্ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্জন করা গেলেও তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পরবর্তী দুটো গুণের শক্তিশালী অস্তিত্ব। আর পরবর্তী দুটো গুণ অর্জন করা যেতে পারে বা বিকশিত হতে পারে কেবলমাত্র সামাজিকভাবে, দলীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

প্রথম দুটে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলনে ঈমানদারদের তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা জীবন পরিচালিত করে তাদের একটি সমাজ বা দল অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে অতিমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। যেন সেই সমাজ, সেই দল বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা না দেয়। আমলে সালেহ্-এর বর্ম দ্বারা আবৃত তথা সৎকাজের দেয়ালে ঘেরা রাষ্ট্রের, দলের বা সমাজের গায়ে শয়তান ছিদ্র করে সেই ছিদ্র পথে প্রবেশ করে তার ভেতরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং দুষ্কৃতি করতে না পারে। এ জন্য ঈমানদারদের সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য সচেতন থেকে একে অপরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা হক অবতীর্ণ

www.pathagar.com

করেছেন, তার ওপরে সুদৃঢ় থাকার ব্যাপারে উপদেশ দেবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পথে যেসব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করার নসীহত করবে।

সৎ পথের ওপরে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত করা বা পরস্পরের ভেতরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কর্তব্য একাকী অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে পালন করা যায় না। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে দায়িত্বও একাকী পালন করা যায় না।

সেই সাথে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-মুসিবত আসে, সে অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্য ধারণের এই অনুশীলনও একাকী করা যায় না। একক কোন ব্যক্তির ওপরে কোন বিপদ এলে সে ব্যক্তি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আর বিপদ যদি সবার ওপরে আসে তাহলে একে অপরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়ে সে বিপদের মোকাবেলা সবাই একত্রিত হয়ে করতে পারে। সুতরাং হক-এর ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্য ধারনের অনুশীলন করা একাকী হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের। এ জন্য প্রথম দুটো গুণের প্রাথমিক দাবীই হলো, এই গুণে গুণান্বিত লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ বা দল গঠন করবে, যেন মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরবর্তী দুটো গুণও অর্জন করা যায়।

ঈমানদারদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেরাই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলবে না, এই বিধান অন্যান্য লোক যেন অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অন্য লোকদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবে।

এভাবে তারা প্রত্যেকটি লোককে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে। ঈমানদাররা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে তোলে সেই আন্দোলনের মাধ্যমে আলোচ্য সূরার শেষে বর্ণিত দুটো গুণের অনুশীলন করবে, সেই অনুশীলনীই হলো ঐ সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি। সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে যে কোন ধরনের দুষ্টক্ষত থেকে মুক্ত রাখবে ঐ জীবনী শক্তি তথা পরস্পরকে হকের ওপরে টিকে থাকার উৎসাহ ও উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণের অনুপ্রেরণা।

www.pathagar.com

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রথম গুণ হলো ঈমান, দ্বিতীয় গুণ আমলে সালেহ্ এবং তৃতীয় গুণ হলো হকের ওপরে টিকে থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি উৎসাহ দান করা এবং উপদেশ দেয়া তথা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা।

'হক'–এর প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে হক–সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই দ্বীনে হক-এর প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তৃতীয় যে গুণটি অর্জন করতে হবে, তা হলো মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে।

যে মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করা হচ্ছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহর দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে সত্য তথা 'হক' গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই 'হক'-এর সাক্ষী হিসাবে গোটা পৃথিবীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো ঈমানদার আমলে সালেহ্কারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী দল বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

বিশ্ব ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্‌র আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে মহাসত্যের দিকে তথা দ্বীনে হক-এর দিকে আহ্বান জানাবে। এই দায়িত্ব ইতোপূর্বে অর্পণ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। কারণ তাদের কাছে 'হক তথা মহাসত্যের জ্ঞান' বর্তমান ছিল এবং এ জন্য তাদেরকে গোটা পৃথিবীর জাতিসমূহের নেতার আসনে আসীন করা হয়েছিলো। তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে, মহাসত্যের প্রতি ডাকবে, মানুষ হিসাবে পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে, এটাই ছিল উদ্দেশ্যে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতিসমূহের নেতার মর্যাদায় তাদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিলো।

কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে, শুধু তাই নয়, পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব যারা পালন করতে অগ্রসর হয়েছে, তাদের প্রতি বনী ইসরাঈলী জাতি তথা ইয়াহুদীরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। যে 'হক' তাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো এবং তার দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর আদেশ দেয়া হয়েছিলো, সেই 'হক'-কে তারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি। বরং সেই 'হক'-কে তারা বিকৃত করেছিলো। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'হক' তথা আল্লাহর বিধানে তারা নিজেদের মর্জি মাফিক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলো। এই বিকৃতির হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সেই নবী-রাসূল যখন তাদেরকে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তৎপর হয়েছেন, তখন ঐ জালিমরা আল্লাহর নবী-রাসূলদেরকে একের পর এক হত্যা করেছে।

ফলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন এবং তাদের ওপরে কিয়ামত পর্যন্ত গযব চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কোরআন বলছে–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَاءُ وْ بِغَضَبٍ مِّنَ

www.pathagar.com

اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেপে বসলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এই ধরনের পরিণতির কারণ এই ছিলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিলো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছিলো আর এটাই ছিলো তাদের নাফরমানী এবং শরীয়াতের সীমালংঘন করার পরিণতি। (সূরা বাকারা-৬১)

এই বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিলেন। তারপর তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের দরুন তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করলেন যে, তাদের জন্য যে মসজিদুল আক্সা-কে কিবলা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো, তা বাতিল করে দিয়ে মক্কার মসদিুল হারাম-কে কিবলা হিসাবে মনোনীত করে দিলেন। আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন হারানোর পরে তারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই অপমানিত আর লাঞ্ছিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তারা নিজের যোগ্যতা ও স্বাধীন শক্তিতে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না, পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর ছত্রছায়া ব্যতীত মুখ খুলে একটি কথা বলার মতো শক্তিও তাদের নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاۤءُ وْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ-ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ-ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ -

এরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে অথবা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করতে পারলে

www.pathagar.com

তা ভিন্ন কথা। আল্লাহর গযব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের ওপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছু শুধু এই জন্য হয়েছে যে, এরা আল্লাহর আয়াত অমান্য করছিলো এবং তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বস্তুত এটা তাদের নাফরমানী ও সীমালংঘনের পরিণতি মাত্র। (সূরা ইমরান-১১২)

(ইয়াহুদীরা কিভাবে টিকে আছে এবং থাকবে, প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে তারা মার খেয়েছে, কোথা থেকে কিভাবে বিতাড়িত হয়েছে, এর বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'অভিশপ্তদের পথ নয়' শিরোণাম থেকে 'অভিশপ্ত ইহুদীদের নৃশংসতা ও আল্লাহর গযব' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

ইয়াহুদীদের দুষ্কৃতির কারণে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করে মুসলমানদেরকে সেই আসনে অভিষিক্ত করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

এই আয়াতে 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো, 'মধ্যপন্থী উম্মত'। কোরআনে ব্যবহৃত 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দটির অর্থ এতটাই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার মাধ্যমে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই উম্মতে ওয়াসাতা শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁদের অনুরূপ সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী ইতোপূর্বে তৈরী হয়েছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তৈরী হবে। অর্থাৎ এমন একটি মানব গোষ্ঠী, যারা সর্বোন্নত যাবতীয় গুণ

www.pathagar.com

বিভূষিত। সুবিচার, সততা, ন্যায়-নীতি এবং যাবতীয় বিষয়ে যারা মধ্যমপন্থা অনুসরণে অভ্যস্থ। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর শাসনামলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর এই পদে কর্মহীন অলস সময় অতিবাহিত করার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে খলীফাতুর রাসূলকে জানালেন, 'হে খলীফাতুর রাসূল! এমন এক দায়িত্ব আপনি আমার প্রতি অর্পণ করেছেন যে, আমাকে কর্মহীন সময় অতিবাহিত করতে হয়। দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, আজ পর্যন্ত একটি মামলা-মোকদ্দমার ফায়সালা করার সুযোগ এলো না।'

অর্থাৎ একটি বছরের মধ্যেও রাষ্ট্রের জনগণের পক্ষ থেকে কেউ একজনও আদালতের দারস্থ হয়নি। জনগণ এতটাই শান্তি-স্বস্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার মধ্যে বসবাস করছে যে, কেউ কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, কারো প্রতি কেউ কটুবাক্য ছুড়ে দেয় না। স্বার্থের কারণে কারো সাথে দ্বন্দ্বও হয় না। ফলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় নি। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত ওমরের কাছে জানতে চাইলেন, 'জনগণের পক্ষ থেকে কেনো একটি মোকদ্দমাও আদালতে পেশ করা হয়নি, এর পেছনের কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাবে বললেন, 'মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে দেশের জনগণ এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রশংসনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে যে, এরা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। ফলে তাদের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না।'

একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে একজন মানুষও এক বছরের মধ্যে আদালতে কারো বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি, তাহলে সেই জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলো কিভাবে নিজেদের চরিত্রে বাস্তবায়িত করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। তাঁরাই ছিলেন গোটা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক, উন্নতি-অগ্রগতির পরিচালক ও অগ্রনায়ক, সভ্যতা-

www.pathagar.com

সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির পথনির্দেশনা দানকারী। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার যাদের জীবন-অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো। অন্যায় বা জুলুমমূলক সম্পর্ক তাদের কারো সাথে ছিল না বরং সেস্থান দল করেছিল ন্যায় ও ইনসাফ। গোটা জগতের সামনে যারা ছিল সর্বব্যাপক ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণ, শুভ ও সুন্দরের প্রতীক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা দ্বীনে হক অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরা এবং সেভাবেই তাঁরা সত্যের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ভেতরে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবমন্ডলীকেই 'উম্মতে ওয়াসাতা' হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে বলেন, তোমরাই উম্মতে ওয়াসাতা–মধ্যপন্থী উম্মত। আমি রাসূলকে যা কিছু শিখিয়ে ছিলাম, তিনি তা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। রাসূলের এই শিক্ষা তোমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষার দিকে তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানাবে। রাসূলের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাঁর অনুসারী দল সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়ে অর্পণ করা হয়েছিলো, তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাসূলের অনুসারী দলকেও কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, সেই দায়িত্বও তারা যথাযথভাবে পালন করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে সত্য পৌছানো হয়েছে কিনা, তথা 'হক'–এর দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে কিনা, এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে। এই জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (নিসা-১৩৫)

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সামনে মুসলমানদেরকে মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তথা দ্বীনে হক-এর সাক্ষী হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক

www.pathagar.com

মুসলমানকে দেখে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান সম্পর্কে যেন এ কথা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহর বিধান সুন্দর ও কল্যাণকর এবং এর কোনো বিকল্প নেই। যাবতীয় দুষ্কৃতিতে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত হওয়া ও মহাসত্যের প্রতি বিদ্রোহ করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে ইয়াহুদীদেরকে পদচ্যুত করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গঠিত ঈমানদার ও আমলে সালেহ্কারী জনগোষ্ঠী-মুসলমানদেরকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের সাক্ষ্যদানের পদে নিযুক্ত করেছেন। এরাই মানব জাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

এই পদে আসীন হওয়া একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও বিশিষ্টতার পরিচায়ক, এই পদ মানুষকে সম্মান-মর্যাদা ও জীবনের সার্বিক সফলতা এনে দেয়। যদি এই পদের যথাযথ ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে এই পদের যে দায়িত্ব, এই পৃথিবীর অন্য সকল দায়িত্বের মধ্যে সবথেকে কঠিন ও গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার পরিচয় দিলে গোটা পৃথিবী জুড়ে যেমন ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত মুসলিম মিল্লাতের ওপরে। কিয়ামতের ময়দানেও মহান আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাব দিতে হবে। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো ধরনের অযোগ্যতার পরিচয় দিলে তা তেমন ক্ষতি বয়ে আনবে না, কিন্তু এই দায়িত্ব এমনই এক কঠিন দায়িত্ব যে, বিন্দু পরিমাণ অবহেলার পরিচয় দিলে মানবতাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেই সাথে গোটা সৃষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দায়িত্ব পালন করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহভীতি, ন্যায়-পরায়ণতা, সততা, সত্যপ্রিয়তা, আদল-ইনসাফ, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার দিক দিয়ে গোটা মানবমন্ডলীর জন্য জীবন্ত আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, অনুরূপভাবে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতকেও সারা দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত জাতির কাছে নিজেদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ব্যবহার ও অন্যান্য যাবতীয় কিছুর মাধ্যমে জীবন্ত আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই মুসলিম মিল্লাতের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ব্যবসার

www.pathagar.com

ধরন, কথাবার্তা, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি দেখে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার অর্থ, সততার প্রকৃত অর্থ, সত্যবাদিতা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা যেন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

এই দায়িত্ব অর্পণ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী-রাসূলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও যদি এই দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হতো। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই এই কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রতি। গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে তাদেরকে নিজেদের জীবন চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের কল্যাণকারিতা তুলে ধরতে হবে। মানুষের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর বিধানই পৃথিবীর মানবতার কল্যাণের একমাত্র উপযোগী বিধান, আর অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান কল্যাণের উপযোগী নয়।

মহান আল্লাহর মনোনীত যে বিধান তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে তা আল্লাহ তা'য়ালার সাধারণ বান্দাদের কাছে পৌছাতে আমরা যদি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করি, কিয়ামতের দিন যদি আমরা আল্লাহর দরবারে এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হই যে, আমাদের ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, তা আমরা যথাযথভাবে পালন করিনি। তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হবো। পৃথিবীতে যাবতীয় ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের কারণে আমাদেরকেই দায়ী করা হবে। পৃথিবীতে যে সম্মান-মর্যাদার আসন-নেতৃত্বের আসন আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, এই আসনই আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেবে।

এই পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে কোরআন রয়েছে, রাসূলের সুন্নাহ্ রয়েছে-রয়েছে সাহাবা কেরামের গোটা জীবন চরিত। এগুলো বাস্তবে প্রয়োগ অনুসরণ না করার কারণে পৃথিবীতে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যত প্রকার ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেবে, গোমরাহী, অসততা, পথভ্রষ্টতা, অবিচার, অন্যায়, অত্যাচার তথা মানব কল্যাণের বিরোধী ও মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর যতো কিছু দেখা দেবে, তার জন্য পৃথিবীর

www.pathagar.com

অন্যান্য ভ্রষ্ট চিন্তা-নায়ক, নেতা, বুদ্ধিজীবী, ইবলিস শয়তান, মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানদের সাথে সাথে আমাদেরকেও অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করা হবে।

সুতরাং 'হক'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নিজেরা পরস্পরকে মহান আল্লাহর 'হক'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং সেই সাথে পরস্পরের 'হক' তথা বান্দার 'হক'-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিষয়টি শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেই দায়িত্ব পালন করা হবে না, সাহাবা কেরাম যেমন তা বাস্তবে অনুশীলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তা বাস্তবে অনুসরণ করে দেখাতে হবে। নতুবা কিয়ামতের দিন আসামীর কাঠগড়ায় যেমন দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্যর্থ লোকদের কাতারে গিয়ে মহাক্ষতি বরণ করতে হবে।

'হক'-এর বাস্তব সুফল

মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে শুধু মক্কারই নয়, গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতা ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আরবদের কাছে যুদ্ধ ছিল তাদের আয় রোজগারের সর্বোত্তম মাধ্যম তথা মহৎ পেশা। যুদ্ধহীন জীবন তাদের কাছে ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক এবং গবেষকবৃন্দ বলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায়-উপকরণের দৈন্যতা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন ক্ষেত্রের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি তাদের সমাজে ঐক্য, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকা।

এ ধরণের নানাবিধ কারণে তাদের রক্তের শিরায় শিরায় যুদ্ধ যেন মিশে ছিল। কারণে বা অকারণে যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা এবং লুঠতরাজ করা তাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হত। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, চারণভূমিতে পশু চরানোর দখলদারী এবং নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রথমে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ধরনের যুদ্ধ তাদের ভেতরে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত ফলে তাঁরা যুদ্ধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কারণে-অকারণে যুদ্ধে জড়িত থাকার ফলে তাঁরা নররক্ত দর্শনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের চরিত্রে কল্পনাতীত পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

অর্থপ্রাপ্তির আকাংখা এবং লোভই তাদেরকে যুদ্ধোন্মাদ ও জঙ্গী করে তুলতো। আরবের কোন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র ধারণ করতো, তখন তার মনের কোণে যে আকাংখা জাগ্রত থাকতো তাহলো, সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ, দাস-দাসী ইত্যাদী হস্তগত করবে। কেননা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিল তাদের কাছে বড় পবিত্র সম্পদ। যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাকর পেশা। ব্যবসা বা নিজের দেহের শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল তাদের কাছে অপমানজনক।

শত্রু ভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রীসহ পশুসম্পদ ও নারী-পুরুষদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মানুষগুলোকে তারা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করতো বা বিক্রি করে দিত।

আরো একটা কারণে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো, তাহলো নিজেদের সাহসিকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। একে অপরের আভিজাত্য প্রদর্শন এবং তা নিয়ে গর্ব করা এবং পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেকে একজন সাহসী বীর হিসাবে সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাংখা। তাকে সবাই সাহসী যোদ্ধা বলুক, বিখ্যাত বীর বলুক এটা ছিল তাদের মনের ঐকান্তিক কামনা।

এ উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কোন ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতো। তাকে বীর এবং সাহসী হিসাবে সবাই জেনে যেন তার পশুচারণ ভূমিতে অন্য কেউ পশু চরাতে যেন সাহস না পায়, তার বাসস্থানের পাশে যেন কেউ বাস করতে সাহস না পায়, তার কূপ থেকে যেন কেউ পানি নিতে সাহস না পায়, তার তুলনায় অন্য কেউ যেন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে, তার মত রং এবং ধরনের পোষাক যেন কেউ পরিধান না করে, সে যাকে খুশী হত্যা করবে, কেউ যেন প্রতিবাদের সাহস না পায়, সে যে কোনো নারীকে ভোগ করবে কেউ যেন বাধা দিতে সাহস না পায়, তার ওপর কেউ যেন মাথা উঁচু করে উচ্চ কণ্ঠে কথা না বলে, সবাই যেন তাকেই নেতা হিসাবে মান্য করে, তাকে সবাই যেন সেবা-যত্ন করে এ ধরনের কামনা-বাসনা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেও তারা যুদ্ধ করতো।

www.pathagar.com

মনের এ ধরনের কামনা-বাসনা ব্যক্ত করে তারা অজস্র কাব্য রচনা করেছে। আজো সেসব কাব্য ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান। বর্তমান পৃথিবীতে পরাশক্তিগুলো যেমনভাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ লক্ষ্যে, প্রয়োজনে রক্তের খেলায় মেতে ওঠে, সে যুগেও তেমনইভাবে একজন ব্যক্তি তার প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে তরবারী ধারণ করতো।

'আইয়ামূল আরাব' অর্থাৎ আরবের লোকগাঁথা পাঠ করলে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে যতগুলো ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং দশকের পরে দশক জীবিত থেকেছে তা সবই ছিল তাদের অহঙ্কার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের কারণে। 'হারবে বাসুস' বা বাসুস যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র নিজের অহঙ্কার এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রাখার হীন উদ্দেশ্যে। বনী তাগলাব এবং বনী বকর গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল।

বনী তাগলাবের গোত্রপতি ছিল কুলাইব ইবনে রাবিয়া। তার নীতি ছিল তার কূপ থেকে কেউ পানি নিতে পারবে না এবং অন্য কারো পশুকে সে পানি পান করতে দিত না। সে যেখানে শিকার করতো, সেখানে অন্য কাউকে শিকার করতে দিত না। সে যে চারণভূমিতে পশু চরাতো, সেখানে অন্য কারো পশু চরাতে দিত না। সে যেখানে অগ্নি প্রজ্জলিত করতো সেখানে আর কাউকে আগুন জ্বালাতে দিত না। একবার বনী বকরের গোত্রে এক অতিথির আগমন ঘটলো। সে অতিথির উট চরতে চরতে তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের চারণভূমিতে গিয়ে তার উটের সাথে চরতে থাকে। কুলাইব তা দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে তীর ছুড়ে উটের স্তনে বিদ্ধ করলো। বনী বকরের সে অতিথি তার উটের এই দুর্দশা দেখে চিৎকার করে বললো, 'আহ্হা, কি আফসোস ! এ কি অসম্মান !' বনী বকর গোত্রের প্রতিটি লোকের রক্ত যেন প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। তাদের অতিথির এই অপমান কিছুতেই তারা সহ্য করলো না।

এই গোত্রের ভেতরে আত্মীয়তার বন্ধনও ছিল। বনী বকর গোত্রের জাসসাস ইবনে মুররা তার বোনকে বিয়ে দিয়েছিল বনী তাগলাব গোত্রের গোত্রপতি কুলাইবের সাথে। এই জাসসাস স্বয়ং গিয়ে তার বোনের স্বামী কুলাইবকে হত্যা করলো। কুলাইবের ভাই মুহালহিল তার ভাই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে ঘোষনা

www.pathagar.com

দিল। মুহালহিল কেনো বনী বকর গোত্রের জাসসাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষনা দিল–অহঙ্কারে লাগলো বনী বকর গোত্রের। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ ৪০ বছর। এই দুই গোত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সে যুগে আরবদের ধারণা ছিল, কেউ নিহত হলে তার আত্মা পাহাড়-পর্বতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়। সে পাখির নাম তারা বলতো হামা পাখি বা সাদা পাখি। নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখি হয়ে উড়তো আর বলতো,'পান করাও আমাকে পান করাও!' আবার কেউ ধারণা করতো, কেউ নিহত হলে যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তাহলে সে নিহত ব্যক্তি কবরে জীবিত থাকে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে মৃত অবস্থায় থাকে। কারো বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে কবরে সে অন্ধকারের ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তার কবর আলোকিত হয়। এ সমস্ত কুসংস্কারের কারণে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতো। ফলে যুদ্ধে বা অন্য কোন কারণে যারা নিহত হত, তাদের গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো ফয়সালায় না এসে যুদ্ধের পথই অবলম্বন করতো। নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কেউ যদি বিলম্ব করতো বা কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিত, তাহলে তা ছিল তাদের কাছে লজ্জার বিষয়। এ সব ছিল তাদের কাছে নীচুতা এবং মর্যাদাহানীকর ব্যাপার। সুতরাং কোন প্রকার আপোষে না এসে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

আরবের কবিগণ তাদের কবিতায় নিজ নিজ গোত্রকে কোন অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা যেন করা না হয়, এ ধরনের কবিতা রচনা করে তাদেরকে উস্কানী দিত। তারা নিহত ব্যক্তির মাথার খুলিতে মদ পান করতো। আরবদের বিশ্বাস ছিল কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত না হয়ে অন্য কোন কারণে শয্যায় শুয়ে মারা গেলে তার আত্মা নাক দিয়ে বের হয়। আর নাক দিয়ে আত্মা বের হওয়া ছিল তাদের কাছে চরম অপমানজনক বিষয়। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাতে নিহত হলে তার আত্মা বের হয় আঘাতপ্রাপ্ত সেই ক্ষতস্থান দিয়ে। এটা ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু। এ কারণে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা যাওয়াকে তারা বলতো, 'অমুক নাক নিয়ে মরেছে'। আর যুদ্ধের ময়দানে কেউ নিহত হলে তারা বলতো, 'সে নাক নিয়ে মরেনি'। নাক নিয়ে মরা অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত না হয়ে

www.pathagar.com

অন্যভাবে মরা ছিল লজ্জার বিষয়। এ জন্য তাদের কবিগণ গর্ব করে বলেছে, 'আমাদের গোত্রের কোন নেতা নাক নিয়ে মরেনি।' অর্থাৎ তাদের গোত্রের কোন নেতা শয্যায় শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেনি।

ইয়াওমে মাসহালান যুদ্ধ, তাহ্লাকুল লামাম যুদ্ধ, দাহেস যুদ্ধসহ এ ধরনের নানা যুদ্ধ তাদের ভেতরে কোনো যুক্তি সংগত কারণে সংঘটিত হয়নি। সামান্য ঘোড় দৌড় নিয়ে–কার ঘোড়া আগে দৌড়ালো আর কার ঘোড়া পরে দৌড়ালো এই নিয়ে দাহেস যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রায় ৫০ বছর ধরে এই অহঙ্কার প্রদর্শনীর যুদ্ধ চললো। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের ভেতরে শুধুমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে প্রায় ১০০ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। যথা সময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা না হলে উভয় গোত্রই ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিল বদর ইবনে পাশা। উকাজের মেলায় এই লোক একস্থানে উপবেশন করে সামনের দিকে তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে কোন কারণ ছাড়াই অহঙ্কার প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঘোষনা করলো, 'গোটা আরবের ভেতরে আমিই হলাম সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমার চেয়ে কেউ যদি নিজেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করে তাহলে তার সাহস থাকলে যেন আমার পায়ে তরবারীর আঘাত হানে।' লোকটির এ অর্থহীন ঘোষনা অনেকের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বনী দাহমান গোত্রের একজন যুবকের শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। সে এসে বদর ইবনে পাশার পায়ে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। আর যায় কোথা, শুরু হয়ে গেল কুখ্যাত ফুজ্জার যুদ্ধ। কিনানা গোত্র এবং হাওয়াজেন গোত্রের ভেতরে এমন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যে, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এই দুই গোত্রের মধ্যে আর আপোষই হলো না।

শেষ ফুজ্জার যুদ্ধও ছিল প্রতিহিংসা আর অহঙ্কারের অনিবার্য পরিণতি। ঐতিহাসিকদের মতে আরবের শেষ ফুজ্জার যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের ছাব্বিশ বছর পূর্বে হিরার রাজা নোমান ইবনে মুনজের আরবের উকাজ নামক স্থানে যে বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হতো, একটা বাণিজ্য বহর সে মেলায় প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন তিনি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার বাণিজ্য বহরের

www.pathagar.com

নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে ?' তার প্রশ্নের জবাবে কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার বাণিজ্য বহরের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।' অপর দিকে হাওয়াজেন গোত্রের নেতা উরওয়াতুর রাহহাল অহঙ্কার প্রদর্শন করে বললো, 'আমি আপনাকে সমস্ত আরবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলাম।'

হাওয়াজেন গোত্রের এই নেতার কথা কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশের শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হাওয়াজেন গোত্রের নেতা হিরার রাজার বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে পথিমধ্যে তায়মান নামক এলাকায় হত্যা করলো। পরিণতিতে যা হবার তাই হলো। এই দুই গোত্রের পুরোনো শত্রুতায় ঐ হত্যাকান্ডের ঘটনা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। উভয় গোত্রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশ গোত্র কানানা গোত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেল আর বনী সাকিফ গোত্র এগিয়ে গেল হাওয়াজেন গোত্রের পক্ষে। ইয়াওমে শামতাত, ইয়াওমে শারব ও ইয়াওমুল হারিবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় চার বছরের অধিক কাল এই যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিভৎসতা এতই প্রকট ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের অতীতের সমস্ত যুদ্ধের নৃশংসতাকে এই যুদ্ধ ম্লান করে দিয়েছিল।

কেনানা গোত্রের বারাদ ইবনে কায়েশ তায়মান নামক এলাকায় যখন হাওয়াজেন গোত্রের উরওয়াতুর রাহহালকে হত্যা করে, সে সময় কুরাইশরা উকাজের মেলায় ছিল। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছা মাত্র তারা মক্কার কা'বাঘরের দিকে চলে আসছিলো। কিন্তু তারা কা'বার এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াজেন গোত্র তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে ফেললো। ফলে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ, গোটা দিন যুদ্ধ চলার পরে রাতে কুরাইশরা কা'বা এলাকায় প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ফলে হাওয়াজেন গোত্র যুদ্ধে বিরতি দেয়। কিন্তু তারপর দিন থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফিজারের এই শেষ যুদ্ধ ছিল ফিজার আল বারাদ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পূর্বে আরো তিনবার ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধ প্রথম হয়েছিল কেনানা এবং হাওয়াজেন গোত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়বার হয়েছিল কুরাইশ এবং হাওয়াজেনের মধ্যে।

www.pathagar.com

তৃতীয় বার হয়েছিল হাওয়াজেন এবং কেনানা গোত্রের মধ্যে। সর্ব শেষ ফিজার যুদ্ধে কুরাইশ এবং কেনানার যৌথ বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হারব ইবনে উমাইয়া। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের পিতা এবং হযরত মুয়াবিয়ার দাদা।

আরব ভূখন্ডে 'হক'-এর কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বে এটাই ছিল সেখানের লোকগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে তারা নিশ্চিত ধ্বংস ও সর্বগ্রাসী অনলে ভস্ম হয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবা কেরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হয়ে যে দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফলে দ্বীনে হক-এর জীবন্ত ও বাস্তব সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলো আরব জাহানসহ গোটা পৃথিবীর মানুষ। যুগ-যুগ ধরে যুদ্ধ ও নানা ধরনের অত্যাচারে জর্জরিত পরস্পর বিরোধী আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে পরস্পর একই মোহনায় মিলিত হয়ে মানবেতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের প্রতি এই গোত্রদ্বয় এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব ত্যাগ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলো যে, যা আপন ভাইয়ের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। দ্বীনে হক এভাবেই মানুষের ভেতরে বাস্তব সুফল পরিবেশন করেছিলো।

দ্বীনে হক অনুসারে জীবন পরিচালিত করলে এভাবেই মানব জীবন সুন্দর, কল্যাণময় ও সজীব হয়ে ওঠে। দ্বীনে হক-এর আগমন পূর্ব অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا–وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا–كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ–

আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে

www.pathagar.com

রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলী তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত বা এই নিদর্শনাবলী থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা ইমরান-১০৩)

অর্থাৎ তারা এমন ধরনের অন্যায়-অত্যাচারে পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, জাতি হিসাবে তারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যেতো। এই অবস্থাকেই আল্লাহ তা'য়ালা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের প্রান্তে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করে বলেছেন, দ্বীনে হক অবতীর্ণ করে তিনি তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। কিভাবে রক্ষা করলেন, দ্বীনে হক গ্রহণ করার কারণে তাদের পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অমানবিকতা বিদায় গ্রহণ করলো এবং তারা দ্বীনে হক পরিবেশিত সর্বোত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হলো। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া জীবন বিধানের অতুলনীয় সুন্দর রূপ-সৌন্দর্য এভাবেই সমুজ্জল করে তোলেন, এসব দেখে গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে সত্য পথ অনুসরণ করতে পারে।

দ্বীনে হক কিভাবে পরস্পরের ভেতর থেকে যাবতীয় তিক্ততা মুছে দিয়ে তাদের মধ্যে প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানবেতিহাসে এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। মক্কা থেকে যাঁরা নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল মক্কার মুসলমান ও মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এভাবে মদীনার মুসলমানরা দ্বীনে হক-এর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অপিরিচিত লোকদেরকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাদের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলো। মক্কার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে মদীনার খাযরাজ গোত্রের ধনাঢ্য ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে রাবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছিলো।

তিনি একদিন হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ডেকে বললেন, 'ভাই, মদীনার সবাই জানে আমি ধনী মানুষ। আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ আমি

www.pathagar.com

দু'ভাগে ভাগ করছি। একভাগ তুমি গ্রহণ করো। আর আমার দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয়, তাকে আমি তালাক দিচ্ছি। ইদ্দত অতিবাহিত হবার পরে তুমি তাকে বিয়ে করো।' হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সা'দের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভাই, তোমার ধন-সম্পদে মহান আল্লাহ বরকত দিন। আমার এসবে প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু আমাকে মদীনার বাজারের পথটি দেখিয়ে দাও।' মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান তথা দ্বীনে হক এমন মানুষই তৈরী করেছিলো, পৃথিবীর মানবেতিহাসে তাদের অনুরূপ দ্বিতীয় আরেকটি মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই দ্বীনে হক বর্তমানেও এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে, এর বাস্তব প্রয়োগে এখনও সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ তৈরী হতে পারে।

'হক'-এর বাস্তবায়নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। নবী রাসূলদের দাওয়াত যারা কবুল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁরা একতাবদ্ধ করে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে একই সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত করেছেন এবং সেই সংগঠিত শক্তিকে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মক্কার জীবনে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। যেসব মহান ব্যক্তি তাঁর দাওয়াত কবুল করেছেন তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে 'হক'-এর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মক্কায় 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র অনুকূল না হবার কারণে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করার ফলে 'হক'-এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের নিয়ে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই গোটা পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানানো এবং 'হক'-এর ভিত্তিতে তাদের জীবনকে রঙিন করা।

এই পথে যারা বাধা দিয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সহজ-সরল কথায় যারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে

www.pathagar.com

পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত করে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের পথ নিষ্কন্টক করেছেন। এই কাজ নির্জনে একাকী, শুধুমাত্র মসজিদ, খান্‌কাহ্ বা মাদ্রাসার চার দেয়ালে নিজেদেরকে বন্দী রেখে করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য একটি সংগঠনের পতাকা তলে হকপন্থীদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে তথা 'হক'-এর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে তথা 'না-হক'-এর মূলোৎপাটন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালোকাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালোকাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে

www.pathagar.com

ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে 'হক'-এর দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া–নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'হক'-এর তৎপরতা চালাতে হবে। 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে নেয়া হয়েছে–অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ–

পৃথিবীতে সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো। (সূরা ইমরান-১১০)

www.pathagar.com

'হক'-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের প্রক্রিয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবমন্ডলীর কল্যাণের লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং এই জীবন বিধান অনুসারে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছেই মহান আল্লাহর এই বিধান প্রাণের চেয়েও প্রিয়। হাদীসেও এ কথা বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের কাছে তার নিজের জীবন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের তুলনায় আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর আদর্শ সর্বাধিক প্রিয় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না। এই তাগিদ অনুসারে ঈমানদার লোকগুলো স্বাভাবিকভাবেই ইসলামকে সমস্ত কিছুর ওপরে স্থান দেবে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, সে যাকে সর্বাধিক ভালোবাসে তার স্বার্থ যে কোনো অবস্থায় উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং কথা ও আচরণের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা বা আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। ঈমানদার তার সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের জন্য উজাড় করে দেবে–এটাই ঈমানের দাবি। কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনের ধন-সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং ঈমানদার যে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে ভালোবাসে, তা অনুসরণ করে, স্বাভাবিকভাবেই সে ইসলামকে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অবলম্বন করবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষ্য হিসাবে সে নিজেকে উপস্থাপন করবে। মানুষ যেমন তার ভালোবাসার প্রকাশও কথা ও কাজের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মহাসত্যের পক্ষে তথা দ্বীনের হক-এর পক্ষেও কথা ও কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

পারস্পরিক কথাবার্তায় ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরবে। যেখানেই কথা বলার সুযোগ আসবে, সেখানে পরিবেশ ও প্রসঙ্গ অনুধাবন করে মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তা প্রয়োগের ফলে ব্যবহারিক জীবনে এর কল্যাণসমূহের বর্ণনা অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবে। লেখার সুযোগ থাকলে সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনে হক-এর দিকে মানুষকে

www.pathagar.com

আহ্বান জানাতে হবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মতবাদ-মতাদর্শ আবিষ্কৃত হয়েছে, লেখনীর মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রকাশ করে তার তুলনায় মহান আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান যুগে প্রচারের যেসব মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব মাধ্যমকে মহান আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দ্বীনে হক-এর সাথে পরিচিত করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রিন্টিং মিডিয়া ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়াসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যতগুলো মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, তা কাজে লাগাতে হবে। মানুষের মন-মস্তিষ্কে দ্বীনে হক-এর মর্মবাণী পৌছানোর জন্য চিন্তা-গবেষণা করে প্রচার ও প্রসারে নিত্য-নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী চিন্তাবিদদের একত্রিত করে মাঝে-মধ্যে গোল টেবিল বৈঠক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কোরআন-হাদীসের তাফসীরের আয়োজন করতে হবে। মহান আল্লাহর বিধানের যাবতীয় দিকসমূহ যুক্তি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

অপরদিকে যে আদর্শের দিকে মুসলমানরা মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষের সামনে এ কথাই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি সর্বপরি কল্যাণ লাভ করতে হলে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে আদর্শ প্রচার করা হবে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে আগ্রহী হবে। তারা জানতে চাইবে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা দ্বীনে হক-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদের বাস্তব জীবনধারা কেমন। ঈমানের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিচার ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, বাণিজ্য নীতি, সম্পদ বন্টন নীতি তথা যাবতীয় নীতিমালা কোন্ ধরনের কল্যাণের স্বাক্ষর বহন করছে, কোন্ ধরনের সৌন্দর্য-সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোন্ ধরনের আলো বিকশিত করছে তা পৃথিবীর মানুষ জানতে চাইবে এবং তা জানার অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে লন্ডনের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি। ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন মুসলমান সেখানের একজন খৃষ্টান নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জানার দাওয়াত দিয়ে তাকে কোরআন পড়তে দিয়েছিলো। মাতৃ ভাষায় অনুদিত কোরআন পাঠ করে সেই নারী উক্ত মুসলমান লোকটিকে বলেছিলো, 'এবার সেই কোরআনটি দাও, যা তোমরা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করো।' মুসলমান লোকটি অবাক বিস্ময়ে খৃষ্টান নারীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'আমাদের কোরআন তো একটি, আপনি দ্বিতীয় কোরআনের কথা কেনো বলছেন?' খৃষ্টান নারীটি উপহাস করে জবাব দিয়েছিলো, 'আমাকে যে কোরআন তুমি পড়তে দিয়েছো, সেই কোরআনের নীতিমালার সাথে তোমাদের বাস্তব জীবনধারার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়েই তোমাকে দ্বিতীয় কোরআনের কথা বলেছি।'

সুতরাং যে নীতিমালার দিকে মুসলমান পৃথিবীর অন্যান্য মানুষকে আহ্বান জানাবে, সেই নীতিমালা সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ-اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই প্রয়োগ করো না? (সূরা বাকারা-৪৪)

সুতরাং পৃথিবীর মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর যে দায়িত্ব মুসলমানদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজেদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বাস্তবায়ন করে এর যাবতীয় কল্যাণ পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থানপন করতে হবে। যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো স্থানে, পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী ও জাতির সাথেই মুসলমানদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে, মুসলমান যে নীতি আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যে আদর্শ অনুসরণ করে তারা কল্যাণ লাভ করেছে, তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি,

www.pathagar.com

নিরাপত্তা, স্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে, তা যেনো সেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বাস্তবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। তাহলে তারা দ্বীনে হক-এর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে।

'হক'-এর সাক্ষ্য দান ও বর্তমান মুসলমানদের কর্মনীতি

মহাক্ষতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ও সফলতা অর্জনের জন্য পরস্পরকে 'হক'-এর দাওয়াত দানের ব্যাপারে ওপরে উল্লেখিত দিকসমূহ অবলম্বন করাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বলে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের লালট লিখন। যে কারণে ইয়াহুদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হতে থাকে, তাহলে ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহুদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

'হক'-এর ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহুদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে মুসলমানরা আপন রব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে

www.pathagar.com

স্মরণ করে শুরু করবে এবং এটাই ছিলো তাদের ঈমানী দায়িত্ব। অমুসলিম জাতিসমূহ কোনো দায়িত্ব গ্রহণকালে যে শপথ বাক্য পাঠ করে, সেখানে তারা নিজের ধ্যান-ধারণা অনুসারে স্রষ্টাকে স্মরণ করে। আমেরিকা-ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শপথ গ্রহণকালে তারা বাইবেলের ওপরে হাত রেখে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণকালে শপথ বাক্যে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না।

আমি প্রথম বারের মতো যখন আমার নিজ এলাকা পিরোজপুর সদর ১ নম্বর আসন থেকে মহান আল্লাহ রহমতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করলাম, তখন বাজেট অধিবেশনে আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করলাম, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ তাদের মৃত নেতাদেরকে স্মরণ করে বক্তৃতা শুরু করছেন। মুসলিম হিসাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণের সৎসাহস দেখাতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। আমার জন্য নির্ধারিত সময়ে আমি আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের হাম্‌দ না'ত পাঠ করে আমার বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি' এই কথাটুকু বলতেই আমি লক্ষ্য করলাম পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণ আমার দিকে সচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় তারা অনুমান করেছিলো আমি তাদেরই অনুরূপ কোনো নেতাকে স্মরণ করবো। আমি বক্তৃতার সূচনা এভাবে করলাম, 'আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে, আমার সবটুকু শ্রদ্ধার শেষ রেশটুকু বিলিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথমে স্মরণ করছি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী ও বিশাল আকাশের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে।'

মুসলমানরা 'হক'-এর স্বপক্ষে এবং 'হক'-কে সর্বোচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুখের কথা ও লেখনী ব্যবহার করা তো দূরে থাক, তারা এর বিপরীত কাজটিই অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে। মুসলমান হিসাবে নিজেকে দাবি করে, পাশাপাশি মুখের কথা, বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা হচ্ছে। দ্বীনে হক-কে তথা মহান আল্লাহর বিধানকে মানুষের জীবনে অপ্রয়োজনীয়, সেকেলে, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক, অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম নামধারী লোকগুলো প্রিন্টেড এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোয় ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী লোকজন অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল চালু করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহ 'হক'-এর বিপরীত পথেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতায় ও সাহিত্যে 'হক'-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, কৃষিজীবী, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক তথা মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ লোকজন নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ভিন্ন জাতির সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইসলামের বিপরীত নীতি আদর্শে প্রতিপালিত, বিপরীত পরিবেশে বর্ধিত কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকগুলোর ঘৃণ্য জীবনধারার তুলনায় মুসলিম মিল্লাতের লোকজনের জীবনধারা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের তুলনায় মুসলমান দাবিদার লোকগুলোর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভৎসরূপে প্রকাশ ঘটছে। অমুসলিমদের জীবনধারার আর মুসলিম দাবিদারদের জীবনধারায় কোনোই পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমান মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে অমুসলিম জাতিসমূহ এ কথাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলমানদের কাছে অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ নেই, এই জন্যই তারা আমাদের নীতি আদর্শ পরম মমতাভরে অনুসরণ করছে।

মুসলমানদের কেনো এই দুঃখজনক অবস্থা হলো, বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য একটু পেছনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ইসলাম বিবর্জিত আধুনিক জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ইতিহাস–যে ইতিহাস রচিত হয়েছে ইউরোপের ধর্ম বিরোধী গোষ্ঠী দ্বারা বা তাদেরই মানস সন্তানের হাত দিয়ে, এসব ইতিহাসে তারা যখন পড়ছে যে, ইউরোপে ধর্ম ছিল প্রগতি এবং মানব কল্যাণের অন্তরায়। তখন এসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ ইসলামকেও প্রগতির অন্তরায় মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ইসলাম মানেই মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং এই আদর্শ মানব কল্যাণের অন্তরায়। সুতরাং ইসলামকে সমাজ থেকে উৎখাত করতেই হবে। ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে এই মুসলিম নামধারী পন্ডিতরা ইসলামকে পাদ্রীদের পোপতন্ত্রের

www.pathagar.com

ন্যায় প্রগতি বিরোধী বলে ধারণা করছে, আবার কেউ জেনে বুঝে নিজের কলম এবং মাথা ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রি করে উচ্ছিষ্টের লোভে ইসলামের বিরোধিতা করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন বা করেছেন, তাদের ভেতরে অধিকাংশ পন্ডিতই ইসলাম সম্পর্কে বহু অমুসলিম চিন্তা নায়কের তুলনায় ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে পিছিয়ে আছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ–যারা অমুসলিম, তারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন, ঠিক এ সময়ে তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদগণ ভ্রান্ত মতবাদ-মতাদর্শ নিয়ে গবেষণায় বিভোর হয়ে আছেন। এই শ্রেণীর মুসলিম নামধারী চিন্তা-নায়করা পরিত্যক্ত আদর্শ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার অঢেল সময় পান, কিন্তু তারা সময় পান না ইসলামকে নিয়ে একটু মাথা চিন্তা-গবেষণা করার। তারা নিজের ঘরে গিলাফে মোড়া কোরআন খুলে দেখার সময় পান না।

অপরদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে যারা কোরআন-হাদীস নিয়ে চর্চা করছেন, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত নন। তারা বিজ্ঞান চর্চা করেন না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাকে নবুয়াত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর আলেম সমাজ গবেষণা করেন-বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা করেন এবং চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁরা কেন এমন করেন, এরও যুক্তি সম্মত কারণ রয়েছে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে গোটা পৃথিবী শাসন করেছে ইংরেজ জাতি। ভারতীয় উপমহা দেশেও তারা দস্যুর মত আক্রমন করে প্রায় দুই শত বছর শাসন করেছে। তারা জানতো, তারা চিরদিন এই দেশে থাকতে পারবে

www.pathagar.com

না। সুতরাং তারা চলে যাবার পরেও যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক গোলামী না করলেও যেন অন্যান্য সমস্ত দিক ও বিভাগে গোলামী করে সেই ব্যবস্থা তারা পাকাপোক্ত করে রেখে যায়।

পরিকল্পনার ভিত্তিতে তারা তাই করেছে। মুসলমানদেরকে তারা প্রকৃত ইসলাম বুঝতে দেয়নি। ইসলামকে তারা বুঝতে দেবে না এ কারণে শিক্ষাকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একভাগের শ্রুতি মধুর এবং আকর্ষণীয় নাম General Education দেয়া হলো। আরেক ভাগের শ্রুতিকটু এবং অবহেলিত নাম ওল্ড স্কীম Old Scheme দেয়া হলো। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার নাম দেয়া হলো Old Scheme। এই নামটি এমন যে, তা শুনতেই খারাপ বোধ হয় এবং এই শিক্ষা গ্রহণের প্রতি কোন আকর্ষণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয় না।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকেনি। কোরআন হাদীসকে বিকৃত করা এবং কোরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে আড়াল করার লক্ষ্যে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অমুসলিম প্রিন্সিপাল নিয়োগ করলো। এভাবে বছরের পর বছর ধরে ২৬ জন অমুসলিম প্রিন্সিপাল সে মাদ্রাসায় থাকলো। সে মাদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করলো, তাঁরা কোরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে কিনা, তাদের কার্যকলাপই তা প্রমাণ করে দিল। স্বামী-স্ত্রীর বিভেদের ফতোয়া দেয়া আর মিলাদ পড়া ব্যতীত তেমন কোনো যোগ্যতাই তাদের ভেতরে ইংরেজগণ সৃষ্টি হতে দেয়নি।

ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি কিছুই তারা জানতে পারলো না। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এই কথাটিই তারা জানতে পারলো না, অথচ তারাই হলো ইসলামের শিক্ষক এবং মুসলমানদের ধর্মগুরু। এই শিক্ষার প্রতি এতটাই ঘৃণা সৃষ্টি করা হলো যে, কোন একটি ধনীর সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না, মাতা-পিতার কোন মেধাবী সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়া হত না। কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, ডানপিটে সন্তানদেরকে মাতা-পিতা মাদ্রাসায় দিতে থাকলেন। এরাই আলেম নামে পরিচিতি পেল। ফল যা হবার তাই হলো। মুসলিম সমাজ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে গেল।

ইসলামকে যারা সত্যই ভালোবাসতো, তাঁরা বাধ্য হয়েই আরেক ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করলো। তার নাম দেয়া হলো কওমী মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় সরকার

www.pathagar.com

কোনো অনুদান দিল না। ফলে সাধারণ মুসলমানদের দানের ওপরে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হতে থাকলো। মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ভিক্ষা করতে রাস্তায় নেমে এলেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে তাঁরা বাধ্য হলেন। ফলে তাদের ভেতর থেকে আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে গেল। সমাজে তাদের কোন সম্মান-মর্যাদা রইলো না। তাদের ভেতরেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি হলো না। মুসলিম জাতিকে তাঁরাও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে টেনে নিতে পারলেন না।

আল্লাহর কিছু বান্দাহ্ যখন প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করে মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানালো, তখন ইংরেজদের তৈরী একশ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি প্রবল বাধার সৃষ্টি করলো। বর্তমান সময় পর্যন্তও তাদেরই অনুসারী এবং উত্তরাধিকারী আলেম নামধারী ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে আসছে। দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বই পুস্তক রচনা করছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতোয়া দিচ্ছে।

বর্তমানেও ইসলামের নামে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা নয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলী, খালিদ, তারিক, মুসা সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ এদেরকে হযরত বিলালের কাহিনী পড়ানো হয়, হযরত খাব্বাবের কাহিনী পড়ানো হয়, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কিভাবে তাঁরা নির্যাতন সহ্য করেছেন, এ কাহিনী পড়ে এবং শুনে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসায়। কিন্তু তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। তাদের ভেতরে এই ধারণার সৃষ্টি হয়, একজন লোক কালেমা পাঠ করে এই মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে আর কাফের এসে তার ওপরে কঠিন নির্যাতন করছে, তবুও সে ইসলাম ত্যাগ করছে না।

কিন্তু তাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না যে, রাসূল তাদেরকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যে প্রশিক্ষণের কারণে তাদের ভেতরে ইসলামী আদর্শ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাঁরা এমন মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এ সমস্ত দিক তাদেরকে শিক্ষা না দেয়ার কারণ হলো, এসব শিক্ষা লাভ করলে তাঁরা ময়দানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁরা সাহাবাদের মতই রক্ত দেবে।

www.pathagar.com

সে সময়ে বাংলা এবং আসামে মাদ্রাসা ছিল মাত্র একটি। সে মাদ্রাসা হলো কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা। ৭৭ বছর ধরে ২৬ জন খৃষ্টান প্রিন্সিপালের পরিচালনার পরে একজন মুসলমান প্রিন্সিপাল দেয়া হয়েছিল। সে প্রিন্সিপালও ছিল খৃষ্টানদের হাতে গড়া তথা তাদেরই মানস সন্তান এবং তিনি যে কেমন ধরনের মুসলমান ছিলেন তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। ১৮৫০ সালে প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিল ডক্টর স্প্রেংগার। তারপর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত শেষ প্রিন্সিপাল ছিল আলেকজান্ডার হেমিলটন হালি। এই মাদ্রাসায় কোন বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

এই মাদ্রাসা থেকে যারা বের হলো তারাও বিজ্ঞান চর্চা বৈধ মনে করতেন না। কারণ তাদের মন মগজে প্রবেশ করানো হয়েছিল, বিজ্ঞান শিক্ষা করা হারাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এসব বিষয় তাদেরকে জানতে দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই পরিকল্পিতভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসীরে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাইবেলের বিকৃত বর্ণনা ইসলামের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজও সে বিকৃত বর্ণনা খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট মুসলমানরা গলধকরণ করছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায় বিজ্ঞান চর্চা করেন না এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞান চর্চাকে তারা হারাম ফতোয়া দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা থেকে নিজেরা বিরত রয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন।

এর ফলে বস্তু জগতকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করতে না পারার কারণে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে তাঁরা নেতৃত্ব দানে সক্ষম হচ্ছেন না। দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসনের ফলে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের প্রতিটি বিভাগ থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত অথচ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শূন্য মুসলমান ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের সমস্ত বিভাগ ও স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠলেই ইসলামী শিক্ষাহীন এই আধুনিক শিক্ষিত নামধারী মুসলিম ব্যক্তিগণই সর্বপ্রথম বিরোধিতা করছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান সন্ধানীরা তথা বিজ্ঞানীরা এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক। গাড়ির পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ীই গাড়ির যাত্রীদেরকে গাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করে এগিয়ে যেতে হয়। ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্ব যতো দিন এই মানব সভ্যতা নামক গাড়িটার পরিচালক ছিলেন অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা, জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, সে সময় পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাধারা-ই মানব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্য, মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত তথা সমস্ত কিছুর মানদন্ড ছিল ইসলাম।

পাদ্রীদের জুলুমতন্ত্রের পরিণতি–ইউরোপের অবৈধ সন্তান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার প্লাবনে ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত মুসলিমদের তৃণখন্ডের ন্যায় ভেসে যাওয়াটা আশ্চর্যজনক নয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার যে গাড়ি দুর্বার গতিতে মানব মন্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে ইসলামী শিক্ষা বর্জিত মুসলিম এমনকি দাড়ি টুপি তসবীহধারী ধার্মিক বলে পরিচিত মুসলিম ব্যক্তির ভেসে যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় বরং এটাই স্বাভাবিক।

এ জন্য মুসলমানদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে। যে দায়িত্ব তাদের ওপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই দায়িত্ব পালন না করার কারণেই ইয়াহুদীদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তারা সামষ্টিকভাবে হক'-এর দায়িত্ব পালন করেনি বরং ব্যক্তিগতভাবে যারা দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের প্রতি তারা নির্মম অত্যাচার করেছে। তাদের সেই ঘৃণ্য আচরণের সাথে বর্তমান মুসলমানদের আচরণে কোনোই পার্থক্য নেই। এরাও জাতিগতভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করছে না। ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে যারা এই দায়িত্ব পালন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইয়াহুদীরা নবী-রাসূলদের ওপরে নির্যাতন চালিয়েছে এবং হত্যা করেছে, বর্তমান মুসলমানরা অনুরূপভাবেই 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারী দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের ওপরে নির্যাতন করছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে কারারুদ্ধ করছে, বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের সাথে যে ঘৃণ্য আচরণ করে ইয়াহুদীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই একই আচরণ মুসলিম নামধারী নেতৃত্ব স্থানীয় লোকগুলো নিজেরা করছে এবং গোটা জাতিকে করতে বাধ্য করছে। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সবথেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত, অবহেলিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত মানুষগুলোর পরিচয় হলো মুসলমান।

যতদিন তারা 'হক'-এর অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছে, ইতিহাস সাক্ষী, ততদিন এই মুসলমানরাই ছিলো পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন। গোটা দুনিয়ার ওপরে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখন থেকে তারা 'হক'-এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, দায়িত্ব পালনে গাফলতির পরিচয় দিয়েছে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। মুসলমানদের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সম্মান-মর্যাদা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কোরআন। এই কোরআনের অনুসরণই কেবলমাত্র তাদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। কোরআন তো এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি যে, এর অনুসারীরা পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হবে। সূরা ত্বা-হা-য় মহান আল্লাহ বলেন–

طٰهٰ–مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى–

আমি কোরআন এ জন্য তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে।

www.pathagar.com

'হক'-এর দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলতা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে–এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটোই দান করেছিলেন। যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভাষায়–

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ–

www.pathagar.com

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খানকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'শয়তানুন আখরাজ অর্থাৎ বোবা শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যখন মহান আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করতেন, তখন আল্লাহর কালাম শোনার জন্য নদীর মাছ কিনারায় চলে আসতো। ইয়াহুদীরা সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর ইয়াহুদী আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অমান্য করে সেই মাছ ধরে ভক্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নিষেধ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা গযব নাযিল করে সত্তর হাজার ইয়াহুদীকে বাঁনরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সেই অপরাধের কথা ইয়াহুদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ–

আর তোমাদের স্বজাতির সেই সব লোকদের ঘটনা তো জানাই আছে, যারা

www.pathagar.com

শনিবারের নিয়ম লংঘন করেছিলো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় দিন যাপন করো যে, চারদিক থেকে তোমাদের ওপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে। (সূরা বাকারা-৬৫)

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'য়ালার এই গযবে আক্রান্ত হলো, তারা সবাই আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে মাছ ভক্ষণ করেনি। কিন্তু তারপরেও তারা গযবের আওতায় এসে গিয়েছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন বনী ইসরাঈলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। জনতার এক অংশ নিষিদ্ধ মাছ ভক্ষণ করলো। তারা কৌশল অবলম্বন করলো এভাবে যে, শনিবারে মহান আল্লাহর কালাম শোনার জন্য মাছগুলো যখন কিনারায় আসতো, তখন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে, সেই মাছগুলো বিশেষ স্থানে যেন বন্দী হয়ে পড়ে। তারপরের দিন অর্থাৎ রবিবারে তারা সেই বন্দী মাছগুলো ধরে ভক্ষণ করতো।

জনতার মধ্য থেকে আরেকটি দল এসব ঘটনা নীরবে দেখেছে। চোখের সামনে মহান আল্লাহর আইন প্রকাশ্যে লংঘিত হচ্ছে, আর তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজেরা অবশ্য সেই পাপ থেকে বিরত থেকেছে, কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার প্রতিবাদ করেনি। হাদীস অনুসারে তারা বোবা শয়তানের ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় যে দলটি ছিলো তারা হলো প্রতিবাদকারী দল। তারা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত থেকেছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মাছ ভক্ষণকারীদেরকে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এভাবে মাছ ভক্ষন করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করো না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইয়াহুদী জাতির ওপরে গযব নাযিল করলেন, তখন প্রতিবাদকারী দল ব্যতীত ঐ দুই দলকেই গযবে আক্রান্ত করলেন, যারা মাছ ভক্ষণ করেছিলো আর যারা মাছ ভক্ষণ করেনি কিন্তু কোনো প্রতিবাদও করেনি। মহান আল্লাহর আইন অমান্য করা হচ্ছে দেখে কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেনি।

www.pathagar.com

আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হক কথা বলতে হবে তথা বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। কারণ অন্যায় যে করে আর যে সহে–তারা উভয়েই সমান অপরাধী। হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের আমলে তাঁর অপরাধী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা গযবের ফেরেশ্তাদেরকে প্রেরণ করলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতো যমীনের তলদেশ থেকে লাভা উত্থিত হয়ে গোটা যমীনকে উলট-পালট করে দেয়া হয়েছিলো। এই কাজে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যেসব ফেরেশ্তা দল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা কাজ সম্পাদন করতে এসে দেখলেন, সেখানে এমন একজন লোক রয়েছে, যে ব্যক্তি জীবনের ত্রিশ বছর ব্যাপী আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে।

তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলো, হে আল্লাহ! এই যমীনে তোমার এমন একজন বান্দাহ্ রয়েছে, যিনি ত্রিশ বছর ধরে তোমারই দাসত্ব করে যাচ্ছে।' আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তিকেও আযাবে নিক্ষেপ করো। কারণ গোটা জাতি যখন পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, তখন সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত ছিলো। লোকজনকে আল্লাহ বিরোধী কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য একটি কথাও বলেনি।

সুতরাং মহান আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে 'হক'-এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, গোটা মানবতাও যদি আল্লাহ বিরোধী পথে ধাবিত হয়, তবুও একজন ব্যক্তিকে হলেও 'হক'-এর দিকে আহ্বান জানাতে হবে। নতুবা যে গযব আসবে, সেই গযব থেকে আল্লাহভীরু লোক বলে কথিত লোকগুলোও মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ–

এবং দূরে থাকো সেই ভাঙ্গন ও বিপর্যয় থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদেরকেই গ্রাস করবে না, তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধ করেছে। (সূরা আনফাল-২৫)

www.pathagar.com

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, মনে করুন কোনো একটি বাড়ির সামনে যে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা রয়েছে, সেখানে কোনো কুকুর বা বিড়াল মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন তা পরিষ্কার করছে না। পথিক যারা নালার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, তারা দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নাকে কাপড় চেপে পথ অতিক্রম করছে। বাড়ির মালিকও পথিকের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। কেউ যখন তা পরিষ্কার করলো না, তখন কেবলমাত্র ঐ বাড়ির মালিক শুধু দূষিত পরিবেশের কারণে রোগে আক্রান্ত হবে না, যারা তার চারদিকে বসবাস করে এবং সেই নালার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পথ অতিক্রম করে, তারাও রোগে আক্রান্ত হবে। রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখানে একজনকে অবশ্যই তা পরিষ্কার করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং অন্যায়ের উদ্ভব যেখানেই ঘটবে, সেখানেই প্রতিবাদের ঝান্ডা উত্তোলন করতে হবে। 'হক' কথা বলতে হবে এবং না-'হক'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে–আর এটাই হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্বের অঙ্গন থেকে মুসলমানরা যখনই অপসারিত হয়েছে, ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো বিদায় গ্রহণ করেছে, তখনই রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারী ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত লোকগুলো বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। একের পর এক মহাযুদ্ধের কারণে অগণিত আদম সন্তান পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অসংখ্য মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও চরম ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশ অনাগত মানব সন্তানের জন্য যেমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবী থেকে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী চিরতলে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমান মানব গোষ্ঠীও নানা ধরনের প্রাণঘাতী অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করছে।

রাজনীতির অসৎ নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের হীন স্বার্থে পৃথিবীর এক দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করে রাখছে। প্রয়োজনে যুদ্ধে লিপ্ত করে

www.pathagar.com

নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নানা স্বার্থ উদ্ধার করছে। কোনো একটি দেশেও দেশ ও জাতি প্রেমিক কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে অধিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না, দেশ ও জাতির স্বার্থে যারা তৎপর, প্রয়োজনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে দেশদ্রোহী লোককে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। জাতীয় উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। প্রায় দেশেই তাদের অনুগত লোকদের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে সে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রাখছে।

অর্থনীতির অঙ্গন থেকে আল্লাহভীরু লোকগুলো যখন বিদায় গ্রহণ করেছে, তখন চরম মুনাফাখোর-সুদখোর ও দস্যু-তস্করের দল অর্থ জগতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে মানবতার ওপরে শোষণমূলক পুঁজিবাদ চাপিয়ে দিয়ে মানবতাকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। ফলে পৃথিবীর মানুষগুলোকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করা হয়েছে, অর্থোপার্জনকে এমন কঠিন করা হয়েছে যে, 'সবথেকে দায়িত্বপূর্ণ ও মহৎ কর্ম অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালন–আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' নারীদেরকে সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাকেও শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে। শিশুদের অধিকার হরণ করে তাদেরকেও পেটের ভাতের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এতে করে তাদের সুকুমার বৃত্তিসমূহের অকাল মৃত্যু ঘটছে, দুর্ব্যবহার পাবার ফলে তাদের ভেতরে নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের প্রতি যৌন নিপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, বড়দের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ভেতরের সুপ্ত চেতনাসমূহ অসময়ে জাগ্রত হচ্ছে এবং তারা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থোপার্জনের নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-বন্ধনহীন পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নারীদেহ, অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সমাজ, দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে। যার যেমন খুশী তেমন পথে অর্থোপার্জন করছে, এতে করে দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দেশের পরিবেশ কতটা কলুষিত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো মানসিকতার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন–নারীকে সেই

www.pathagar.com

আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে পণ্যদ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে। নেশা জাতিয় মাদকদ্রব্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জাতির মেরুদন্ড কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে আখিরাত প্রেমিক লোকগুলো যখন সরে এসেছে, তখন সেই জগৎ দখল করেছে বিকৃত রুচিসম্পন্ন নেশায় অভ্যস্ত যৌন উন্মাদগ্রস্ত লোকগুলো। এরা গান-বাজনার নামে অশালীন ও নগ্ন নর্তন-কুর্দনের প্রচলন ঘটিয়েছে। শ্রবণের অযোগ্য অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক গীতমালা রচনা করে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তা তুলে দিয়েছে। চরিত্র বিধ্বংসী ছায়া-ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মানবতাকে পাপ-পঙ্কিলতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। যুদ্ধ-মারামারি, হত্যা-ধর্ষন, শ্লীলতাহানী, রাহাজানী, ছিন্তাই, চুরি, ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনের যাবতীয় কলা-কৌশল সম্বলিত সিনেমা প্রদর্শন করে কিশোর, তরুণ-যুবকদেরকে বিপদগামী করা হচ্ছে। পাঠের অযোগ্য কবিতা ও উপন্যাস রচনা করে কিশোর-তরুণদের সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে ধর্ষনের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধিদের পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলে দেখা যাবে, অস্বাভাবিকহারে কিশোর-তরুণরা অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা এমন ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, যা কল্পনা করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হত্যা-ধর্ষণ, ছিন্তাই এমন কোনো অপরাধ নেই, যা কিশোর-তরুণদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। পড়ালেখার জন্য শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক তার কিশোর ছাত্রদেরকে শাসন করছে, কিশোর ছাত্র প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে সেই শিক্ষককে হত্যা করছে। এসবই হলো বর্তমান মানবতা বিরোধী চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের বিষময় ফল।

অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র থেকে ঈমানদার মুসলমানদের দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাদাপসারণের ফলে মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় না হয়ে অকল্যাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। পৃথিবীর অসংখ্য আদম সন্তানকে দারিদ্র সীমার নীচে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের অভাবে শতকোটি আদম সন্তান মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অগণিত অর্থ-সম্পদ নিছক আমোদ-ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নামে ব্যয় করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ধুমপান আর মদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীন রেখে বন্য পশু-প্রাণীর পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নিছক শখের বশে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে।

আবিষ্কার, উদ্ভাবন তথা বিজ্ঞানের জগৎ থেকে যখন ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলো নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন পরকালের ভীতিশূন্য লোকগুলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তারা সীমা-পরিসংখ্যাহীন অর্থ এবং নিজেদের মেধা ব্যয় করে মানবতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। হত্যা ও মানুষকে বিপন্ন করার নিত্য-নতুন উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করা হচ্ছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে ঈমানহীন লোকগুলো যখন মানব জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, তখনই গোটা পৃথিবী জুড়ে মহাভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়, অশান্তি-অনাচার আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ওপরে চাপিয়ে দেননি। এগুলো মানুষের নিজের হাতেরই উপার্জন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ–

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। (সূরা রূম-৪১)

আল্লাহ ভীতিহীন লোকগুলো যখনই কোনো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে, তখনই সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আখিরাতের ভীতিহীন স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত লোকগুলো পৃথিবীর নেতৃত্বে আসীন, এদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড হলো পৃথিবীর পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً–

এরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ফাসাদে ভরে তোলে। সেখানের মর্যাদাবান-সম্মানীত লোকগুলোকে লাঞ্ছিত করে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। (সূরা নামল-৩৪)

www.pathagar.com

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈমানহীন লোকগুলো মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনের প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বের আসন যখন দখল করেছে, তখন শুধু মানবতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গোটা পৃথিবীর পরিবেশই বিনষ্ট হয়েছে। এদের কর্মকান্ডের কারণে পৃথিবীর প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। উর্ধ্বজগতে যে ওজন স্তর রয়েছে, তাতে ফাটল ধরেছে তাদেরই ভারসাম্যহীন কার্যকলাপের দরুন। পবিত্র কোরআন ঈমানহীন লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেছে–

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ–

সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ট হয় এবং ফসল ও প্রাণীকুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়। (সূরা বাকারা-২০৫)

ক্ষমতার দম্ভে এরা গোটা পৃথিবীর মানুষগুলোকে নিজের গোলামে পরিণত করতে চায়। ভিন্ন দেশের ধন-সম্পদের লোভে এরা যে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা এরা করে না। সাধারণ চক্ষু লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এরা অন্য দেশে আগ্রাসন চালায়। এদের ঘৃণ্য চরিত্র আল্লাহর কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ–

তুমি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই দেখতে পাবে––পাপাচার, সীমালংঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে। (সূরা মায়িদা-৬২)

নিজেদেরকে এরা গোটা দুনিয়ার মোড়ল মনে করে। ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে এরা দুর্বল জাতিসমূহের প্রতি অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। আল্লাহর কোরআন তাদের কর্মকান্ড এভাবে প্রকাশ করেছে–

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً–

www.pathagar.com

তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে? (সূরা হামিম সিজদা-১৫)

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে সামগ্রিক অরাজকতা চলছে, গরীব জাতিগুলোর ওপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করা হচ্ছে, নিছক ক্ষমতার গর্বে ক্ষুধার্থ মজলুম জাতিসমূহের ন্যায্য সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের ভান্ডার পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, ক্ষমতাশালী লোকগুলো দুর্বল মানুষগুলোর প্রভুর আসনে বসে আপন লোভ-লালসা ও খেয়াল-খুশীর বেদীমূলে তাদের যাবতীয় অধিকার বিসর্জন দিচ্ছে, সুবিচার ও ন্যায়-নীতির মূলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ লোকদেরকে কোণঠাসা করে এবং অসৎ ও নীচমনা লোকদেরকে স্বগর্বে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের অশুভ প্রভাবে জাতিসমূহের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, ন্যায়-পরায়ণতা, মহানুভবতা ও যাবতীয় সৎ গুণাবলীর উৎসসমূহ শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা, অসততা, পরস্বার্থ অপহরণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, না-ইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ড ও অনাচারসমূহের পুঁতিগন্ধময় নালার মুখ খুলে দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর স্বঘোষিত মোড়লদের মনে পররাজ্য দখলের লিপ্সা উগ্র হয়ে উঠেছে, তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর ওপর তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। দুর্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতা হরণ করে, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নিজেদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস পূর্ণ করার লক্ষ্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এসব কিছুর মূলে যে কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলো পৃথিবীর মানব জীবনের প্রত্যেক বিভাগে ঈমানদার আমলে সালেহ্কারী লোকগুলোর অনুপস্থিতি। তারা যদি 'হক'-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর চেহারা এমন করুণ আকার ধারণ করতো না।

হক-এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং মানব জীবনে সার্বিক ক্ষেত্রের যাবতীয় দিকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ট্রাফিক পুলিশের যে দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতের ওপর অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব যদি তারা যথাযথভাবে পালন করতো, তাহলে গোটা মানবতা বর্তমানে এই করুণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতো না।

www.pathagar.com

মানুষসহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদরাজি তথা সার্বিক পরিবেশে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকগুলোর পতনে পৃথিবী এক তিক্ত পরিবেশের মোকাবেলা করছে। পৃথিবী থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিদায় গ্রহণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, অত্যাচার আর নির্যাতন এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রয়েছে, সেই পথটি হলো মুসলমানদের নিজ জীবনে 'হক'-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং পৃথিবীর মানুষদেরকে 'হক'-এর দিকে আহ্বান করা। এই দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতে থাকলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে পূর্বের ন্যায় আবার পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকদের হাতে তুলে দেবেন–এটা মহান আল্লাহর ওয়াদা এবং তাঁর ওয়াদাই সবথেকে সত্য।

'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

মানুষের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথমে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। এরপর সে ব্যক্তির প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হবে যে, সে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করার বিষয়টিকে এবং আমলে সালেহ্ করাকে নিজের জন্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ বলে মনে করেছে, সেই পথের দিকে অপরকেও সে আহ্বান জানাবে এবং এর নামই হলো 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত। ঈমানদার ব্যক্তিকে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং এই কাজকে মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয় কর্ম চাঞ্চল্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজেই এই উদ্দেশ্যের প্রতি সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্যই হলো, তারা মহান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে। তারা মানুষকে পার্থিব কোনো বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে না। বস্তুগত স্বার্থের দিকে আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে না। পৃথিবীর বিশেষ কোনো জাতি, দেশ বা কোনো নেতার প্রতি আনুগত্য করার জন্য

www.pathagar.com

আহ্বান জানাবে না। 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবে, তাদের দাওয়াত হবে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোনো জীবন বিধান অনুসরণ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, বন্দেগী, আরধনা-উপাসনা ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না। একমাত্র তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কারো রচিত আইন মানা যাবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না। এই কথার দিকেই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দেবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সূরা হামীম সাজ্‌দাহ্-৩৩)

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার সেই পরিবেশে, যে পরিবেশে মুসলমানদের ওপরে নির্মম-নিষ্ঠুর লোমহর্ষক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে। আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, তারপর তা যখন অঙ্গারে পরিণত হয়ে প্রচন্ড তাপ নির্গত করতে থেকেছে, তখন মুসলমানদেরকে ধরে শরীর থেকে বস্ত্র খুলে উন্মুক্ত দেহে সেই আগুনের অঙ্গারের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে যাঁদের ওপরে নির্যাতন করা হয়েছে, হযরত খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা ছিলেন তাঁদের একজন। একদিন তাঁকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উন্মুক্ত শরীরে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, তোমার পিঠে অমন গর্ত এবং কোমরটি এতো সরু কেনো? এমন পিঠ আর কোমর তো আমি কারো দেখিনি!'

হযরত খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু বললেন, 'ভাই ওমর, তোমার বোধহয় মনে নেই, ইসলাম কবুল করার অপরাধে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে রক্তাক্ত করেছে, অনাহারে রেখে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিয়েছে। তারপরও যখন আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি তখন তারা আগুনের অঙ্গারের ওপরে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার শরীরের গোস্ত-চর্বি

www.pathagar.com

গলে গলে আগুন নিভে গিয়েছে, তবুও তারা নির্যাতনে বিরতি দেয়নি। আগুনের অঙ্গারসমূহ আমার পিঠের ভেতরে প্রবেশ করেছিলো, তখন থেকে আমার পিঠে যে দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, আজো পর্যন্ত তা মুছে যায়নি।'

যখন মুসলমানদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছিলো, যে সময়ে মুসলমান হবার অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না, এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মুসলমানরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলো, আমি একজন মুসলমান।

তারা হাসি মুখে যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও নির্মম মৃত্যুকে কবুল করে এ কথা অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে, 'যে মুসলমানদের ওপরে তোমরা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছো, যাদেরকে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট দিচ্ছো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছো, লাঞ্ছিত অপমানিত করছো, যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

'আমি একজন মুসলমান' মানুষের জন্য এর থেকে উচ্চতর স্তর আর দ্বিতীয়টি নেই। বিস্তীর্ণ এই যমীন, বিশাল ঐ আকাশ তথা গোটা মহাবিশ্বের যিনি অধিপতি সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হলো মুসলমান, একামাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব দেবে, তাঁরাই হলো শাসক শ্রেণী আর সবাই শাসিত। পৃথিবীর যাবতীয় নে'মাত তাদের জন্য এবং পরকালেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাতের অধিকারী হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র তাঁরাই কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী। মানুষের এর থেকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয় দ্বিতীয়টি আর নেই। সুতরাং মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় পেশ করা সবথেকে গর্বের ও অহঙ্কারের বিষয়। আমি মুসলমান–মহান আল্লাহর সবথেকে ঘনিষ্ঠ একজন, এটাই আমার পরিচয়।

www.pathagar.com

নিজের এই পরিচয় পেশ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ধন-সম্পদ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মুসলমান'। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত মানুষের ভেতরে ঐ ব্যক্তির কথাকে সবথেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি নিজে ঈমান এনেছে, ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করেছে এবং মহান আল্লাহর পথ অনুসরণ করার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মানুষকে মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করার, আনুগত্য করার আহ্বান জানিয়ে এ কথা ঘোষণা করেছে যে, 'আমি আল্লাহ তা'য়ালার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি, আমি মহান আল্লাহর আনুগত্য করছি। আমি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছি, অতএব তোমরাও তাঁরই বিধান অনুসরণ করো। আমি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব কবুল করেছি, তোমরাও একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল করো।' এই কথার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বোত্তম কথা যমীনের বুকে ও আকাশের নীচে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সুতরাং 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারীর সর্বপ্রথম গুণ হলো সে মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং এই কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই কামনা করবে। পৃথিবীর কোনো উদ্দেশ্য মনে গোপন রেখে সে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে না। দাওয়াত দেবে যেমন একমাত্র আল্লাহরই দিকে, তেমনি একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে দাওয়াতী কাজ করবে।

www.pathagar.com

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে দুঃসাহসী হতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজটি অসীম সাহসের কাজ, কোনো ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে দাওয়াতের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অস্থির ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী যারা, তাদের পক্ষে মানুষের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন কবুল করে অকুতোভয়ে রাসূলের সাহবায়ে কেরাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা পৃথিবী থেকে যাদেরকে বিদায় করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

পৃথিবীর বড় বড় রাজা-বাদশাহ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী সেনাপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের ওপরে চোখ রেখে নির্ভীক চিত্তে তাঁরা 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করেছেন। দৃঢ়পদে এবং অকম্পিত কণ্ঠে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তদানীন্তন যুগে সমকালীন বিশ্বে ফেরাউন ও নমরুদের মতো শক্তিধর ও সামরিক শক্তির অধিকারী দ্বিতীয় কোনো শাসকের অস্তিত্ব ছিলো না। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সেই ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তার চোখের ওপরে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, 'তুমি জুলুম করছো, এই জুলুম ত্যাগ করে সেই আল্লাহর গোলামী করো–যিনি তোমার আমার এবং গোটা বিশ্বলোকের রব।'

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও দোর্দন্ড প্রতাপশালী নমরুদের দরবারে একই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই সমকালীন যুগের শাসকদের সামনে একই ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহর দ্বীনের দিকে যারাই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, দুর্বলতা-কাপুরুষতা, লোকলজ্জা, দোদুল্যমানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেই 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছেন।

'হক'-এর সন্ধান যারা পায়নি, তারা মহাক্ষতির দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হচ্ছে। 'হক'-এর দাওয়াত বঞ্চিত মানুষগুলো সাগরের অথৈ জলে নিমজ্জিত, সর্বগ্রাসী

www.pathagar.com

হুতাশনে পরিবেষ্টিত, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্ত, ছায়া ও খাদ্য-পানিহীন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে তারা মৃতবৎ–এদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার মানেই হলো তাদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত পৌছানো। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালায় নিমজ্জিত লোকগুলোর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টাকারীকে উত্তাল তরঙ্গের সাথে লড়াই করেই ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হয়। সর্বগ্রাসী অগ্নি শিখায় পরিবেষ্টিত মানুষগুলোকে যারা উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়, প্রজ্জ্বলিত অনলের প্রচন্ড তাপকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যেতে হয়। ঘন তমসাবৃত যামিনী দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীদের দৃষ্টিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কিন্তু অগ্রসরমান যাত্রী তার যাত্রা ক্ষণিকের জন্যও স্থগিত করে না। কারণ অন্ধকার পথের পথিকের জানা থাকে যে, অন্ধকার যতো বেশী গভীর হবে পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ততোই জোরে ঘোষিত হতে থাকবে।

অন্ধকারের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ করে সাহসী যাত্রীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হলে পূর্ব নীলিমায় তরুণ তপন উদিত হয়ে গোটা ধরণীকে যখন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে তখন তমসাবৃত যামিনীর তেজোদীপ্ত দুর্বিনীত যাত্রীদের পথের যাবতীয় বাধা স্বাভাবিকভাবেই অপৃসত হয়। পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পথিমধ্যে বাধার অলংঘনীয় বিন্ধ্যাচলের দিকে হাতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যস্থল যদি যোজন যোজন দূরে অবস্থিত হয় আর পথের দূরত্বের দুর্ভাবনায় পথিক যদি যাত্রা পথে কদম উঠানোর পূর্বেই মনের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সে পথিক তার কাংখিত স্থানে পৌছতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি হিমশীতল শুভ্র তুষার আবৃত পর্বতের গগনচুম্বী শৃঙ্গ বিজয় আকাংখায় যারা মনস্থির করেছেন তারা শৃঙ্গ আরোহন পথে প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শীতল হাতছানিকে নির্মম পায়ে পদদলিত করেই তাদের লক্ষ্যস্থলে দৃঢ়পদে পৌছতে সক্ষম হন।

সূর্যের প্রচন্ড কিরণে উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর যাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, মরুভূমির বিশালতা দেখে ঘাবড়ালে তা অতিক্রম করা যাবে না। ভয়াল জলধির উত্তাল উর্মিমালার হিংস্র কিরীটে পদাঘাত করে যারা যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তারাই কেবল পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের অবস্থান নিরূপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী

www.pathagar.com

মিথ্যার বিজয় ভেরীর উচ্চ নিনাদে যারা কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে মসজিদ ও খানকার চার দেয়ালের মধ্যে আত্মরক্ষা করে তাদের পক্ষে মহাসত্যের দুন্দুভী বাজানো অসম্ভব। গাজী অথবা শাহাদাতের দুর্দমনীয় উগ্র কামনা হৃদয়ে যারা পোষণ করে তারাই কেবল মহাসত্যের দুন্দুভীতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং মহাসত্যের প্রতি যারা আহ্বান জানাবেন, 'হক'-এর দাওয়াত যারা দেবেন, তাদেরকে দুঃসাহসী হতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে যারা নিজের হাত-পায়ের শৃংখল ও কণ্ঠের জিঞ্জির মনে করে, সত্য প্রকাশের কাজের মধ্যে যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি দেখতে পায়, তাদের পক্ষে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার কাজ কোনো ভীরু-কাপুরুষের কাজ নয়, দুর্বল চিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী লোকদের কাজ নয়, কুকুরের চিৎকারেই যাদের হৃদকম্পন শুরু হয়, এ কাজ তাদেরও নয়। এ কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সর্বপরি নিজের প্রাণকেও বাজি রাখতে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের পরোয়া করে না এবং একা হলেও অকম্পিত কণ্ঠে 'হক' উচ্চারণ করার মতো হিম্মত রাখে।

দৈহিক নির্যাতন, সামাজিকভাবে অপদস্থ হওয়া, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা, জান-মালের ক্ষতি স্বীকারে যারা প্রস্তুত রয়েছে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরী ও ফাঁসীর মঞ্চকে স্বাগত জানাতে যারা দন্ডায়মান, কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই 'হক'-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে ময়দানে ভূমিকা রাখা এবং 'হক' উচ্চারণ করা সম্ভব। কারো রক্তচক্ষু, গর্জন আর নির্মম চাবুকের নৃত্য দেখে এবং গোটা পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজের কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু এই কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগ নেই। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, গোটা বিশ্বলোকের রাজাধিরাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দাওয়াত দানকারী ময়দানে একা-নিঃসঙ্গ নন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قَالَ لَاتَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى–

www.pathagar.com

তোমরা ভয় পেয়ো না, শঙ্কিত হয়ো না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি এবং দেখছি। (সূরা ত্বা-হা-৪৬)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেন, মহান আল্লাহ তার সাথে থাকেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা যখন সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন। আর যারা 'হক'-এর বিরোধিতা করবে, তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ মহান আল্লাহই করবেন। অতএব কোনো শক্তির পরোয়া না করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে নির্ভীক চিত্তে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে আদেশ দিয়েছিলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ-اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ-الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ-

হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেও পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রুপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা হিজর-৯৪-৯৬)

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তাকে অবশ্যই অটুট মনোবলের অধিকারী হতে হবে। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এ সম্পর্কে আলোচ্য সূরার তাফসীরে ঈমানের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দাওয়াত দেয়ার কাজে যারা বাধার সৃষ্টি করে, মহান আল্লাহর শক্তির মোকাবেলায় তারা মাছির পাখার অনুরূপও নয়, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ছাপ হৃদয় ও মন-মগযে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও মহানত্বের সুস্পষ্ট ছাপ যার মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একমাত্র তার পক্ষেই একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে বুক টান করে বিরোধিদের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হওয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে নির্লোভী হতে হবে

'হক' প্রতিষ্ঠার ময়দানে ব্যক্তিত্বহীন লোকজন অচল মুদ্রার অনুরূপ। এদের পক্ষে কোনো ব্যাপারেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করা, দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, প্রতিকুল ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করা, বিরোধিদের আক্রমনের মোকাবেলায় উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যাবতীয় লোভ-লালসা প্রত্যাখ্যান করে নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অনমনীয় থাকা ব্যক্তিত্বহীন লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের লোকগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিজ চরিত্রে বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করলেও এদের ব্যক্তিত্বের থলে প্রকৃতপক্ষে শূন্য এবং এই শূন্যতা বিরোধিদের পক্ষের চতুর লোকদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। তারা এ কথা ভালো করে বোঝে, লোকটি মুখে যা দাবি করে, সে দাবির সাথে তার অন্তরে দৃঢ়তা নেই। ভয়-ভীতি বা পার্থিব লোভ-লালসার কাছে সে লোকটি নিজেকে সোপর্দ করে দেবে। সুতরাং 'হক' বিরোধী লোকদের কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং অনমনীয় হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ–

যারা বিশ্বাস করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন মনে না করে। (সূরা রূম-৬০)

বিরোধী পক্ষ 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে যেন দুর্বল বা ব্যক্তিত্বহীন মনে না করে। তারা একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করলো অথব. নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলো, নিন্দা আর অপবাদের ঝড় তুললো, 'হক'-এর প্রতি আহ্বানকারীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকলো আর অমনি 'হক'-এর প্রতি দাওয়াত দানকারী মনোবল হারিয়ে ফেললো, উৎসাহ-উদ্দীপনা তার ভেতর থেকে বিদায় নিলো, দাওয়াতী কাজের ময়দান ত্যাগ করে ঘরে নিশ্চুপ বসে রইলো, দাওয়াত পেশকারী যেন এমন হালকা ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়।

দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য 'হক' বিরোধিরা নানা ধরনের লোভ-লালসা প্রদর্শন করবে, উচ্চপদ, সম্মান-মর্যাদা, পার্থিব দিক থেকে অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিতে চাইবে। জাতীয় সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে 'হক'পন্থীদেরকে

www.pathagar.com

সাময়িকের জন্য হলেও আপোষের পথে পরিচালিত হবার অনুরোধ করবে, এসব কিছুর মাথায় পদাঘাত করে 'হক'-এর দাওয়াতী অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। নিজেদেরকে উদ্দেশ্য সচেতন হতে হবে, লক্ষ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের বিশ্বাস ও ঈমানে সর্বাধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্কল্পে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং আমলে সালেহ্‌র বর্মে নিজ চরিত্র দুর্ভেদ্যভাবে পরিবেষ্টিত করতে হবে।

বিরোধী পক্ষ যেন এ কথা অনুভব করতে পারে, এই লোকগুলোকে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা প্রদর্শন করে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কোনো প্রতারণা-প্রবঞ্চনার কূটজালে এদেরকে বন্দী করা যাবে না। কোনো মূল্যেই এদেরকে ক্রয় করে মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। কোনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবতে ফেলে, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে, পত্র-পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এদেরকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। প্রয়োজনে এরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু মচ্‌কাবে না। এরা আপোষের চোরাগলিতে হারিয়ে যায় না। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর প্রতি ছুড়ে দেয়া যে কোনো অস্ত্রই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তিত্বই তাকে গড়তে হবে–আর এই ব্যক্তিত্ব গড়ার একমাত্র সহায়ক শক্তি হলো ঈমান ও আমলে সালেহ্।

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর এই ব্যক্তিত্ব দেখে সাধারণ মানুষ যখন এ কথা অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, এই ব্যক্তি মুখে ও লেখনীর মাধ্যমে যে কথার দিকে, যে আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই কথা ও আদর্শের ব্যাপারে লোকটি প্রকৃত অর্থেই আন্তরিক। কারণ লোকটি সেই আদর্শ সর্বপ্রথমে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছে, সে যে কথার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে, লোকটি সেই কথাগুলো প্রত্যেক পদে স্বয়ং অনুসরণ করছে। সুতরাং লোকটি যা বলছে তা অবশ্যই সত্য এবং কল্যাণকর। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সাধারণ মানুষের ভেতরে ঐ অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে আমলে সালেহ্‌র বর্মে নিজেকে সর্বপ্রথম আবৃত করতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ তার দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষের ভেতরে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে এর বিনিময় আশা করা যাবে না। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, 'হক'-এর দাওয়াত বিক্রয় যোগ্য কোনো পণ্যের নাম নয়। এই কাজ করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে। প্রত্যেক নবী-রাসূল যখন তাঁদের জাতির কাছে হকের দাওয়াত দিয়েছেন, তখন তাঁরা জাতিকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে–

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا-اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ-

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে দাওয়াতের কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার কাজের বিনিময় আমার আল্লাহর কাছে রয়েছে। (সূরা হূদ-৫১)

'হক'-এর দাওয়াত দানকারী আল্লাহকে সাহায্য করে

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন করে একজন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম হবার যোগ্যতা অর্জন করে। এই যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই মানব জীবনে সফলতা অর্জনের প্রথম দুটো গুণ–ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র কথা আলোচ্য সূরায় সর্বপ্রথমে বলা হয়েছে। মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা, সফলতা অর্জন ও কল্যাণ লাভের জন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর গোলাম হতে হবে। আর এই গোলাম হবার জন্যই ব্যক্তিকে ঈমান আনতে হবে এবং আমলে সালেহ্ করতে হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর সাহচর্য, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা অর্জনের একমাত্র পথ হলো ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর সাহায্যকারী হতে হবে। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ হিসাবে বর্তমান পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোকজন সাধারণ মানুষকে নানা পথপ্রদর্শন করে থাকে।

অমুক পীর সাহেবের মুরীদ হলে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের পথ দেখিয়ে দেবেন, বছর ব্যাপী রোযা পালন করলে, গোটা জীবন ব্যাপী রাতের পর রাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলে, অমুক দোয়া বা তস্‌বীহ্ দিনরাতের অমুক সময় সংখ্যায় এত বার জপ করলে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যাবে–এসব কথা বলে ঈমানদারকে 'হক'-এর দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে নফল নামায-রোযা অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু সাথে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, তাঁরা কোনো পথ অবলম্বন করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন মহান আল্লাহর সাহায্যকারী। আর আল্লাহর সাহায্যকারী যারা হয়, একমাত্র তাঁরাই পৃথিবীতে অবস্থান করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থান করেন।

আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বলতে কি বুঝায়, সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। মহান আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং এই কাজে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'আল্লাহকে সাহায্য করা' বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ-স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই সাথে মানুষকে সত্য ও মিথ্যা পথও প্রদর্শন করেছেন। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে সত্য ও মিথ্যা পথের যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কোনো নাফরমান বা বিদ্রোহী বান্দাকে তাঁর বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য করেন না।

গায়েবী শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা কিতাব অবতীর্ণ করে, যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে এ কথাই বুঝিয়ে থাকেন যে, 'আমার বিধান অনুসরণ করা বা না করার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি আমার নাফরমানী করতে পারো, আমাকে অস্বীকার করতে পারো, আমার বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করতে পারো। কিন্তু তোমার এই ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা থাকার পরও তোমার উচিত হলো, আমার গোলামী ও দাসত্ব করা। কারণ তোমাকে আমিই সৃষ্টি করে লালন-পালন করছি আর এ কাজে আমার সাথে অন্য কেউ-ই শরীক নেই। যদি তা না করো তাহলে তোমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি আমার দাসত্ব কবুল করো, তার উত্তম বিনিময়ও আমি প্রদান করবো।'

এভাবে যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে মহাসত্যের পথে পরিচালিত করা হলো মহান আল্লাহর কাজ। কিন্তু এই কাজ তিনি স্বশরীরে আগমন করে বা বান্দাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে করেন না। তিনি নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে এই কাজ করে থাকেন। মহান আল্লাহ সর্বশেষ এই কাজ করেছেন

www.pathagar.com

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর বিদায়ের পরে এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উম্মতদের ওপরে। সুতরাং কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালো, সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাজে সাহায্য করলো। আর আল্লাহর কাজে যারা সাহায্য করে, একমাত্র তারাই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হলো আল্লাহর কাজে সাহায্য করা। যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেন, মহান আল্লাহর ভাষায় তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ–

আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। (সূরা হজ্জ-৪০)

সাধারণ মানুষে স্বভাব হলো, কোনো ক্ষমতাবান লোকের সাথে যদি তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে, তাহলে সে তা গর্বভরে প্রকাশ করে। এতে করে সে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করে যে, অমুক ক্ষমতাবান লোকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং আমার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ বা অশোভনীয় ব্যবহার করার পূর্বে সতর্ক হওয়া উচিত, আমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, এ কথা ঐ ক্ষমতাবান লোকটি জানতে পারলে তিনি এর কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

ক্ষমতাবান ও সম্মান-মর্যাদার অধিকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে সাধারণ লোকজন আগ্রহ পোষণ করে, তাদের কোনো খেদমত করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু যে কাজটি করলে এই মহাবিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যাবে, তাঁর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করা যাবে, তাঁর বন্ধুত্ব ও সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই কাজটি থেকে একশ্রেণীর ঈমানদার দুঃখজনকভাবে নিজেকে বিরত রেখেছে। সেই কাজটি হলো 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া। 'আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকারী' এর থেকে অহঙ্কার ও গর্বের বিষয় মানুষের জন্য আর কি হতে পারে! সুতরাং 'হক'-এর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছাতে হবে আর ঐ পথেই নিজেকে 'আল্লাহর সাহায্যকারী'দের দলে শামিল করতে হবে।

www.pathagar.com

হকের দাওয়াত দানকারীকে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

'হক'-এর দাওয়াত যিনি দেবেন, তিনি যে বিষয়ে অন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ে তাকে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে। 'হক'-এর দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে, সে পন্থাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখিয়ে দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ–

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহল-১২৫)

যাকে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি 'হক'-এর কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তাঁর সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে 'হক'-এর দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে আক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছে, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে 'হক'-এর দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

'হক'-এর দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এগিয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'—দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই কথকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত

www.pathagar.com

দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

যার কাছে 'হক'-এর দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করার মতো কোনো কথা বলে, তাহলে দাওয়াত দানকারীকে অসীম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিপক্ষ যতো অপসন্দনীয় ও বিরক্তি সৃষ্টিকারী কথাই উচ্চারণ করুক না কোনো, এর মোকাবেলা সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে করতে হবে। মন্দের জবাবে মন্দ বা নোংরামীর জবাব নোংরামী দিয়ে দেয়া 'হক'-এর বিপরীত কাজ। ধীর স্থির মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলতে হবে এবং তার খারাপ আচরণের অনুরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না। যার কাছে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার আচরণ আর দাওয়াত দানকারীর আচরণ যদি সমমানের হয়, তাহলে দাওয়াতের কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী যে কোনো ধরনের অশোভন আচরণ সর্বোত্তম ভদ্রতার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে হবে। কোরআন এভাবে শিক্ষা দিচ্ছে–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ– لَاتِيَةٌ

এসব লোকদের অশোভন আচরণকে ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও। (সূরা হিজর-৮৫)

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে শয়তান সবথেকে বেশী সক্রিয় থাকে। একজন লোক যখন 'হক'-এর দাওয়াত গ্রহণ করে, তখন শয়তানের অনুচরের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর মানুষ যেন কোনো ভাবেই সত্য গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, শয়তান এদিকেই অধিক তৎপর থাকে। এ জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কোনোক্রমেই যেন তার সাথে কোনো একটি দিক দিয়েও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়। শ্রোতার কথায় অনেক সময় মন-মানসিকতা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ধারন করতে হবে। দাওয়াত দানকারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শয়তান তার প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাকে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করতে হবে। (বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা ফালাক ও নাসের তাফসীর পাঠ করুন।)

www.pathagar.com

'হক'-এর দাওয়াত দানকারীকে সর্বক্ষেত্রে কোরআনের যুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এবং শ্রোতাকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে তিরমিযী হাদীসে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা এসেছে এভাবে যে–

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ-وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ-وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ-
وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ-

এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে যারা কোরআন থেকে যুক্তি পেশ করে কথা বলে, তাদের কথার মধ্যেই সত্যতা বিদ্যমান থাকে। জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে যারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে যারা কোরআনের দেয়া রায় অনুসারে বিচার ফায়সালা করে, তাদের বিচারই ন্যায় বিচার হয়ে থাকে। আর কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে যারা আহ্বান করে, তারাই সবথেকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণময় পথের দিকে আহ্বান করে।

www.pathagar.com

'হক' বিরোধিদের ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা

আলোচ্য সূরার তাফসীরে আমরা ইতোপূর্বে গাধা ও খাসীর গল্পের অবতারণা করে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, খাসীর যত্ন তার মালিক এ জন্য বৃদ্ধি করেছে যে, কোরবানীর চাঁদ উঠেছে এবং তাকে কোরবানী করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ বিরোধী লোকদেরকে তাদের ঈমানহীন সৎকাজের বিনিময় হিসাবে এই পৃথিবীতে অধিক ধন-ঐশ্বর্য্য দান করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের সৎকাজ তথা আমলে সালেহর পেছনে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বিধায় তাদের পাওনা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে করে অতীত যুগে ফেরাউন, নমরুদ এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যেক যুগে যারা ভূমিকা পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে সম্পদশালী করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে শান-শওকত, চাকচিক্য ও অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। যারাই মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ভূমিকা পালন করছে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবীতে কর্মের বিনিময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

'হক' বিরোধী লোকদের এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোকগুলো দ্বীনে হক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তারা ইসলাম বিরোধী আদর্শের মোকাবেলায় দ্বীনে হক-এর দুর্বলতা আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোর ক্রমাগত অসফলতা এবং ইসলাম বিরোধিদের চাকচিক্যপূর্ণ ও জাঁকজক এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেখে ধারনা করে যে, আল্লাহ বিরোধী লোকগুলোই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অর্জন করুক, তারাই সর্বত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক, প্রভাব বিস্তার করুক আর যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেয়, তারা তারা দুর্বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে থাক–এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

কারণ ইসলাম বিরোধী শক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য, জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সৌন্দর্য, উন্নতি-অগ্রগতির কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে। তারা উপায়-উপাদানের প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের নীতি-আদর্শ ও কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে

www.pathagar.com

পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীরা নিজেদের কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন করার তেমন কোনো উপায়-উপাদান পাচ্ছে না, এদের লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রচার যন্ত্র নেই, কোনো কিছুরই প্রাচুর্যতা নেই। বস্তুত জীবনেও এরা দারিদ্রতার সমুদ্রে নিমজ্জিত। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাই এটা। তিনি হকপন্থীদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখবেন।

দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকগুলো এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে 'হক' তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন বরং নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত ও তসবীহ্ জপার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন-যাপন করাই যুক্তি সংগত। এই ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা যারা করে, তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকগুলোর অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন–

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–

নিজ কর্মপন্থার ওপরে দৃঢ়-মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (সূরা ইউনুস-৮৯)

দ্বীনে হক বিরোধী, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন-যাপন করে না তাদের অঢেল ধন-সম্পদ দেখে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী নিজের অভাব ও দারিদ্রতার কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্যও মনোক্ষুন্ন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাতের জীবনে সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন আর ঐ লোকগুলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ–

আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথিবীতে যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা হিজ্‌র-৮৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি নিজ জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ-وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ-اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ-اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা

www.pathagar.com

আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ–

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি। এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا–وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ–

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ্ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধী দেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না। (সূরা কাসাস-৭৮)

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার

www.pathagar.com

কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শোনাচ্ছেন–

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ–

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম। সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি–লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম। ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।' হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ–

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না। (সূরা কাসাস-৮০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই

www.pathagar.com

পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর

www.pathagar.com

মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস-৮১-৮২)

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ–فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ–وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ–

www.pathagar.com

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজদাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজর-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায-রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সবক প্যড় ফির সাদাকাত কা, আদালাত কা, শুজাআ'ত কা
লিয়া জায়েগা কাম তুঝছে দুনিয়া কি ইমামাত কা।

দীক্ষা নাও পুনরায় সততার, ন্যায়-পরায়ণতার ও বীরত্বের, তাহলে এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার কাজটি তোমাকে দিয়েই সম্পন্ন হবে।

www.pathagar.com

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাচ্ছির
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
কর্তৃক রচিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা ফাতিহা, সূরা আল-আসর, সূরা লুকমান, আমপারার
তাফসীরসহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

১. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
২. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন
৩. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
৪. আল-কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
৬. দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
৭. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন- ১ ও ২
৮. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৯. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
১০. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১১. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১২. শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
১৩. কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?
১৪. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
১৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোনাজাত
১৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?
১৭. আখিরাতের জীবনচিত্র
১৮. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১-২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com